প্রাতঃস্মরণীয়া

৺মহারাণী শরৎসুন্দরীর

জীবন-চরিত

শ্রীগিরীশচন্দ্র লাহিড়ী কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত।

কলিকাতা
২৬নং স্কট্‌স্ লেন, ভারতমিহির যন্ত্রে,
সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩০১ সাল।

অবতারণিকা

আদর্শ আর্য্য-ললনা,—শরৎসুন্দরীর সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, মহাত্মার লক্ষণ ও জীবন-চরিতের আবশ্যকতা, পাঠক নির্দ্দেশ, চরিত লেখকের প্রমাদ।

প্রায় সাত শত বৎসর ভারত পরাধীনা। যবন রাজ-শক্তির শাসনেই অনেক দিন গিয়াছে; অনেক দুর্দ্দান্ত যবন রাজার পেষণে ভারতের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে। তদানীন্তন ভারতের হিন্দু রাজাদিগের সর্ব্বগ্রাসী লোভে,—পশুবৎ স্বার্থসাধনে,—দুর্দ্দম অভিমানে যে আত্মদ্রোহকর গৃহবিবাদের অনল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, সেই সুযোগে রাজ্যলিপ্সু যবনরাজগণ, পুনঃ পুনঃ ভারতের পশ্চিম প্রান্ত হইতে আসিয়া ভারতবাসীকে পদ-দলিত করিয়াছেন। ভারতের গৌরব,—ভারতের ঐশ্বর্য্য,—ভারতের রত্নখনি,—ভারতের জ্ঞান-ভাণ্ডার প্রাচীন গ্রন্থাবলী, ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়াছে, তথাপি ভারতের গৃহবিবাদের কালানল নির্ব্বাপিত হইয়াছিল না। এবং এখনও হয় নাই। রত্নপ্রসূ ভারত, আজি দূর-দূরান্তরের শৃগাল গৃধিণী পরিবৃত মহাশ্মশান। ভারত সন্তান এখন সকল বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী;—এক মুষ্টি অন্নের জন্য পরের নিকট ভিক্ষার্থী। কিন্তু, কুসন্তান হইলেও মাতৃস্নেহের বিলোপ হয় না। ভারতমাতা, এত কষ্টেও স্বভাবজ স্তন্যে সন্তান পালনে পরাঙ্মুখী নহেন। প্রভূত শস্যে ভারত পরিপূর্ণা। কিন্তু সন্তানগণ এমনই হতভাগ্য যে, বিলাসের চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া, তাহার বিনিময়ে সেই মুখের গ্রাস উড়াইয়া দিতেছে। অলক্ষ্মীর নিশ্বাসে সমস্তই যেন প্রবল ঝঞ্ঝায় মিশিয়া যাইতেছে।

বাস্তবিকই কি ভারতের সকল সুখ, সকল সৌভাগ্য,—সকল

সম্পত্তিই গিয়াছে ? অপাপ-বিদ্ধ আর্য্য-ঋষিদিগের উত্তর বংশ-শ্রেণীর আপনার বলিতে কি, কিছুই নাই ? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, আর্য্যভূমির শ্মশানের ভস্মস্তূপ সন্ধান করিলে, কিছু না কিছু আর্য্য-গৌরবের চিহ্ন অবশ্যই আছে। এই ঘোর দুর্দ্দিনে হিন্দুসন্তান-গণের গুপ্ত অন্তঃপুরে এখনও কিছু না কিছু অম্লান স্বর্গীয় আলোক দৃষ্টি-গোচর হয়। – পতিপ্রাণা সতীর অলৌকিক প্রভায়, এখনও অনেক গৃহ আলোকিত। এখনও লক্ষ লক্ষ আর্য্য-ললনা, আমরণ পরপুরুষের ছায়াস্পর্শ না করিয়া, নীরবে পতি-সেবায়—ধর্ম্মের সেবায়—স্বকর্ত্তব্য পালন করিয়া, পতি-চরণে মস্তক রাখিয়া, তনুত্যাগ করিতেছেন। কিন্তু তাহাতেও আর্য্য-গৌরবের,—আর্য্য ধর্ম্মের,—পর্য্যাপ্ত হয় না। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর গৃহে,—পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশেও এ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আর্য্য-নারী, বাল্যে বিধবা হইয়া, পতির মূর্ত্তি চিন্তা করিয়া যতিধর্ম্মে কৃষ্ণকেশ শুক্লে পরিণত করিলে, অন্য ধর্ম্মাবলম্বী, অতি লৌকিক বলিতে পারেন। অকাল বিধবার দুঃখে হৃদয় বিগলিত হইতে পারে। কিন্তু আর্য্যসমাজ তাহাকে অনন্যদৃষ্টান্ত বোধ করেন না। বরং, সেই সনাতন ব্রতপালনে কোনও বিধবা, ত্রুটী করিলে নিন্দার সীমা থাকে না। আর্য্য-সতী, পতিপ্রেমে আত্মহারা হইয়া মৃত পতির সহগমন করিলেও, আর্য্যনারী-চরিত্রের চরম দৃষ্টান্ত প্রতিপন্ন হয় না। এই সকল আর্য্য সাধ্বীর জীবনী লিখিত হইলে, গৃহে গৃহে স্তূপীকৃত হইত। আর্য্যজাতি এই সকল জীবনকে একাংশে আদর্শ বলিতে পারেন, কিন্তু পূর্ণ জীবন বলিতে বাধ্য নহেন।

আর্য্যনারীর, প্রকৃত কর্ত্তব্য বুঝাইবার জন্য এই স্থলে তাঁহাদের বিবাহ-প্রণালীর আলোচনা করা প্রয়োজনীয়। আর্য্যদিগের জন্মাবধি আমরণ, পান, ভোজন, শয়ন, ভ্রমণ, গৃহধর্ম্ম, সন্তানপালন প্রভৃতি

যাবতীয় কার্য্যের সঙ্গেই ধর্ম্মের বন্ধন। যেমন নর্ত্তকীরা, মস্তকে, কোনও গুরুপদার্থ রাখিয়া, নানা লয়-সংযোগে সর্ব্বাঙ্গ পরিচালনা করে, অথচ, মস্তকস্থ দ্রব্যকে স্থির রাখে। সেইরূপ আর্য্য সন্তানগণ, জন্মাবধি নানা কার্য্যে বিব্রত থাকিলেও, আপন মস্তকোপরি ধর্ম্মস্থির রাখিয়া, জীবনের সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য। তাহা করিলে, সংসারের কোনও দুঃখেই তাঁহাকে ক্লান্ত করিতে পারে না। তাঁহাদের বিবাহও একটি প্রধান ধর্ম্মাঙ্গ সংস্কার। আর্য্যদিগের বিবাহ, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ত্রি-মিশ্রণে সম্পন্ন। বিবাহ, কেবল পতি পত্নীর কায়িক ও মানসিক সুখেই পর্য্যবসিত, অথবা কেবল মাত্র পার্থিব জগতেই সংরুদ্ধ নহে। আর্য্যললনার বিবাহ,—পতির সহিত, পতিকুলের সহিত,—পতিকুলের সংস্পৃষ্ট সকলের সহিত, ঐহিক ও পারত্রিক বন্ধনে সম্বদ্ধ। পতির অভাবেও সে বন্ধন ছিন্ন হয় না। তাঁহার পারলৌকিক আত্মার সহিত, বিধবার দেহাবস্থিত আত্মা চিরসংযুক্ত। তিনি, পতিকুলের চির সাম্রাজ্ঞী।* তাঁহার আত্মা, তাঁহার দেহ, কেবল পতির কার্য্যে, পতির জীবনের সঙ্গে পর্য্যবসিত হইলে তাঁহার সাম্রাজ্ঞীতা রক্ষা পায় না। পতির অভাবে তিনি অর্দ্ধমৃতা; পতির পারলৌকিক আত্মার সহিত তাঁহার আত্মা যেরূপ সংযুক্ত, পতিকুলের সকলের সঙ্গেও সেইরূপ আংশিক নিবদ্ধ। তিনি, গৃহস্থাশ্রমে প্রত্যেকের প্রাপ্য স্নেহ, ভক্তি, দয়া ও আদর হইতে বঞ্চিত করিলেই, তাঁহার গৃহিণীত্ব—পতিকুলে তাঁহার সাম্রাজ্ঞীত্ব রক্ষিত হয় না। এইরূপ নারী-চিত্রই আর্য্য ললনার আদর্শ। যে সুপবিত্রা মহিলার চরিত্র এস্থলে অঙ্কিত হইতেছে,

* হিন্দু পাঠকেরা ইচ্ছা করিলে, বিবাহের মন্ত্রে দম্পতীর প্রতিজ্ঞা-বাক্যগুলি পাঠ করিলেই, সকল সংশয় দুর করিতে পারেন। বাহুল্য জন্য, সংস্কৃত মন্ত্রগুলি এস্থলে উদ্ধৃত হইল না।

আর্য্য-ললনার আদর্শ চরিত্রের বহুলাংশ বোধ করি, পাঠকগণ ইহাঁর চিত্রে দেখিতে পাইবেন। ইনি, পাঁচ বৎসর সাত মাস বয়সে পতিকুলে আসিয়া, বার বৎসর সাত মাস বয়সে বিধবা হইয়াছিলেন। তাহার পর, চব্বিশ বৎসর দশ মাস কাল জীবিতা ছিলেন। শরৎসুন্দরী, বাল্যে পতিকুলে আসিয়া,আপনার পূর্ব্বোক্ত কর্ত্তব্যসকল,অতি সাবধানে নির্ব্বাহ করিয়া,পতিদেবতার পারলৌকিক আত্মার সহিত,—বিশ্বকারণ পরমেশ্বরে বিলীন হইয়াছেন। বিধবা হইয়া, যে ২৫ বৎসর জীবিতা ছিলেন, সে সময়, তাঁহার পবিত্র আত্মার একাংশ,পতিদেবতার পারলৌকিক আত্মার, অপর অংশ, পতিকুলের ও স্বদেশবাসীসকলের আত্মার সহিত, যেন সংযুক্ত ছিল। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত, মহারাণী উপাধিতে, তাঁহার গৌরব কিছুই বৃদ্ধি হইয়াছিল না। তিনি, পতিকুলের এবং স্বদেশবাসি-দিগের হৃদয়ের প্রকৃত সাম্রাজ্ঞী,—রাজরাজেশ্বরী,—সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার ন্যায় সকলকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। তিনি, সর্ব্বদাই আপনার সুখের নিমিত্ত, সকল বিষয়ে কাঙ্গালিনী থাকিয়াও,প্রকৃত কাঙ্গালের সম্বন্ধে কামধেনুস্বরূপ ছিলেন,—দয়াবতী জননী ছিলেন। তাঁহার, আপনার অভাব আমরণ রহিয়া গিয়াছে, অথচ, সাধ্যমতে পরের অভাব পূরণে মুক্তহস্তা ছিলেন। সংসারী, তাঁহার যতি-ধর্ম্ম ও কঠোর নিয়ম দেখিয়া অশ্রুপাত করিত, কিন্তু তিনি, পতিদেবতা আর জগৎপতির সাধনায়,—জগতের সেবায় আত্মোৎসর্গকরিয়া,আপনার সমস্ত দুঃখ,সমস্ত অভাব,বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

আর্য্যজাতির মধ্যে, দানশীলা, দয়াবতী, পতিব্রতা ললনা অনেকে ছিলেন, এবং এখনও দরিদ্রের কুটীর হইতে ধনীর অট্টালিকা পর্য্যন্ত, অনেকেই আছেন। বর্ত্তমানকালের সামাজিক বিপ্লবে,—স্বেচ্ছাচারের প্রবল বেগের মধ্যে,—স্ত্রী-স্বাধীনতা এবং স্ত্রী-শিক্ষার বিকৃত প্রথার মধ্যেও পতিপ্রাণা আর্য্য-গৃহিণী, অনেকে আছেন; তথাপি শরৎসুন্দরীর

জীবন-চরিত সঙ্কলনের প্রয়োজন কি ? এ প্রশ্নের কতক কতক উত্তর পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। এখন আর একটী বিষয়, আলোচিত হইতেছে।

মহাত্মাগণের জীবন-চরিত সঙ্কলনের দুইটী উদ্দেশ্য দেখা যায়। আদৌ তাঁহারা, সমাজস্থিতির সুব্যবস্থায়, সমাজকে যে মূলধন প্রদান করেন, কৃতজ্ঞতার জন্য, সমাজ তাহা স্থায়ী করিতে বাধ্য। দ্বিতীয়তঃ সেই আদর্শ সম্মুখে রাখিলে লোক-শিক্ষার সুবিধা হয়। শত শত কবি-কল্পিত আদর্শে, চরিত্রগঠনের যত সাহায্য না করে, একজন মহাত্মার জীবনীতে, তদপেক্ষা বিস্তর ফললাভ হয়। আর, মহাত্মাগণের কেবল ধর্ম্মমাত্র লক্ষ্য হইলেও, তাঁহাদের সাধনাময়ী জীবনী, কিছু না কিছু বিভিন্ন। তাঁহাদিগকে, সম্ভবতঃ চারি শ্রেণীতে বিশেষিত করা যাইতে পারে। সমাজ, ইহাঁদিগের সকল শ্রেণী হইতেই, প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সম্পূর্ণরূপে ঋণী।

প্রথম এক শ্রেণীর মহাত্মা, জগতকে আপনা হইতে অভিন্ন দেখেন। "সর্ব্বভূতস্থ মাত্মানং সর্ব্বভূতে ত্বমাত্মনি"—এই ভগবদুক্তি, অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। তিনি, সংসারের নানা দুঃখের মধ্যে থাকিয়াও, যে পবিত্রতা, হৃদয়ে যে সত্যের আনন্দ পাইয়াছেন, তাহা জগৎকে বিলাইয়া থাকেন। তিনি, আপনার উৎকর্ষ মাত্রই, কর্ত্তব্য বলিয়া জানেন না ; জগৎকেও সেই পবিত্রতায় লইতে চেষ্টা করেন। তিনি জানেন, বিশ্ব আর বিশ্বাধারে তিনি বিদ্যমান, এবং তাঁহাতে, বিশ্ব ও বিশ্ব-কারণ জগদীশ্বর বর্ত্তমান। অতএব, ধর্ম্মাত্মা, যেমন আত্মশুদ্ধি করিতে ব্যগ্র, জগতের পাপ তাপ নিবারণ করিয়া, নির্ম্মল ধর্ম্ম-জ্যোতি ছড়াইতেও সেইরূপ দায়ী। * সেই জন্য তিনি, নানা বিপদ—নানা

* "যতদিন, পাপ-দমনকর্ত্তা দেখিতে পায়, পাপী ততদিন অদৃশ্য থাকে। কিন্তু, যখন দমনকর্ত্তা না থাকে, তখন সংসারে অনেকেই পাপী হয়। পাপকে জানিতে

যাতনা সহিয়াও, আপনি, আদর্শস্থানে অটলভাবে থাকিয়া, মানব-মাত্রকে সৎপথে আনিতে—সৎশিক্ষা দিতে, আমরণ কর্ত্তব্য-পরায়ণ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, চৈতন্য, খ্রীষ্ট, মহম্মদ এবং শাস্ত্র-প্রণেতা ঋষিরাও অনেকে, এই জাতীয় মহাত্মা ছিলেন। অতএব, জগতে তাঁহাদিগের জীবনী কত মূল্যবান!

আর এক শ্রেণীর মহাত্মা আছেন, প্রায়শই তাঁহারা কৃতার্থ হইতে পারেন না। সুতরাং, তাঁহাদিগকে মহাত্মা না বলিয়া, সৎশিক্ষক বলা যাইতে পারে। তাঁহারা, আদর্শ মহাত্মার গুণের পক্ষপাতী। আপনি সাধনার জন্য হৃদয়ে তিলে তিলে একটী আদর্শ আঁকিতেছেন, কিন্তু, যে দৃঢ়ব্রতে হৃদয় নির্ম্মল হয়, তিনি শেষ পর্য্যন্ত, সেই ব্রত পালন করিতে পারিলেন না; অথচ হৃদয়ের সেই যত্ন-সঞ্চিত আদর্শ, মুছিয়া ফেলিতেও পারেন না। তিনি বিবেচনা করেন, আমি কৃতকার্য্য হই নাই বলিয়া, সমাজকে কেন বঞ্চনা করিব! আমার সাধনার চিত্র দেখিয়া, কেহ না কেহ, পথ পাইবে; কেহ বা, কৃতার্থও হইতে পারে। নীতি, দর্শন, বিজ্ঞানবেত্তা এবং উচ্চ শ্রেণীর কবিরাও, এই শ্রেণীর মধ্যে গণনীয়।

এই সকল সৎশিক্ষকের জীবনের, পুনঃ পুনঃ উত্থান পতনের সহিত, তাঁহাদের প্রণীত পুস্তকের বড়ই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। পুস্তকের উৎপত্তি বীজের এবং মীমাংসার সঙ্গে, তাঁহাদিগের আবেগের বড়ই মিল। সুতরাং গ্রন্থের সহিত, প্রণেতার জীবনী পাঠ না করিলে, পুস্তকের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বুঝা যায় না। জীবনী দেখিলে বুঝা যায়, তিনি, উহা কেন প্রণয়ন করিয়াছেন। জগতে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এস্থলে নবীন কবি

পারিয়া, যে ব্যক্তি, শক্তি থাকিতেও দমন না করেন, জিতাত্মা হইলেও তিনি, পাপে লিপ্ত হইয়া থাকেন।" (মহাভারত আদিপর্ব্ব ১৮১ অধ্যায়)

মাইকেল মধুসূদন, আর প্রাচীন মুকুন্দরামের নাম উল্লেখ করিতেছি। ইহাঁরা দুই জনেই ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। মুকুন্দরাম স্বপ্রণীত চণ্ডীতে আপনার জীবনের যে কিঞ্চিৎ ছায়া দিয়াছেন, তাহা ভিন্ন তাঁহার জীবনী নাই। কবিবর মধুসূদন অল্পদিন হইল অন্তর্হিত হইয়াছেন, তাঁহার জীবনীও প্রকাশিত হইয়াছে। মধুর মধুময় "চতুর্দ্দশ পদী কবিতাবলী" আর "মেঘনাদবধ" কাব্য, তাঁহার জীবনীর সঙ্গে আলোচনা করিলে, কবির উপদেশ, অনুতাপ, আত্মগ্লানি অক্ষরে অক্ষরে অনুভূত হয়। চণ্ডীতে মুকুন্দরাম, আপনার চিত্র, যে কিছু দিয়াছেন, তাহাতেই ফুল্লরার দুঃখ কড়ায় কড়ায় বুঝা যায়।—বুঝা যায় কালকেতু, আর ফুল্লরা, কবি হৃদয়ের জাজ্জ্বল্যমান মূর্ত্তি। ফুল্লরাতে "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগত স্পৃহঃ"—এই ভগবদুক্তির সত্যতা আছে। দুঃখের চরম "আমানী খাবার গর্ত্ত দেখ বিদ্যমান।" জগতের আদ্যাশক্তির সাক্ষাৎলাভ,—প্রচুর ঐশ্বর্য্যলাভে বিগতস্পৃহার কিরূপ মনোজ্ঞ-চিত্র। কবি, আপনার সুখে আপনার দুঃখে, যথাকাল প্রবোধি। তিনি, রাজকর্ম্মচারীর বিকট দৌরাত্ম্য সহিয়াও—ভাগ্যের কঠোর নিগ্রহ ভোগ করিয়াও যে, ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হইতে পারেন নাই, তাহা "—নৈবেদ্যে শালুকলাড়া—" উক্তিতেই প্রমাণ। ফলতঃ কবি, আপনার দুঃখের দশা গোপন রাখিলে তাঁহার প্রণীত পুস্তকের মাহাত্ম্য বুঝা যাইত না।

পুরাণরচয়িতাগণ, না থাকিলে ভারতে লক্ষ লক্ষ বীরের অভিনয়,—লক্ষ লক্ষ সতীর চিত্র,—লক্ষ লক্ষ ধর্ম্মাত্মার আবির্ভাব দেখা যাইত না। সক্রেটিস, নিউটন প্রভৃতি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের জন্মদাতাগণ, আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া, আজি, ইউরোপ আমেরিকার এত উন্নতি ; আর আমরাও, সুখযান-রেলগাড়ী প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক ফলে, জীবনের এক নূতন যুগ দেখিতেছি। দর্শন কি বিজ্ঞান-বেত্তাগণ, আপনার হৃদয়ের

সত্য প্রচার না করিয়া গেলে, পরবর্ত্তীরা অন্ধকারে থাকিতেন। সুতরাং ইহাঁদের জীবনবৃত্তও প্রয়োজনীয়।

তৃতীয় আর এক শ্রেণীর মহাত্মা আছেন, কেবল আত্মোৎকর্ষ ব্যতীত, তাঁহারা সমাজ বা লোক-শিক্ষার্থ অগ্রসর নহেন। ইহাঁদের মধ্যে এক জাতীয় মহাপুরুষ, সমাজ হইতে চির বিদায় লইয়া, ঘোর অরণ্যে বাস করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কার্য্য, লোক লোচনের বহির্ভূত, সুতরাং তাঁহাদের জীবনবৃত্ত সংগ্রহ এক প্রকার অসাধ্য। তবে ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ, গৃহে থাকিয়াই স্বকর্ত্তব্য পালন করেন, তাঁহাদের জীবনী সংগ্রহ দুঃসাধ্য নহে। তাঁহারা সমাজের মধ্যে থাকিয়াও, এরূপে আত্ম গোপন করেন যে, তাঁহাদের হৃদয়ের ভাব অন্যে বুঝিতে পারে না। সেই প্রাণের প্রাণ বিশ্বের বীজে একীভূত হইবার জন্য, তাঁহাদের জীবন-নদী অন্তঃসলিলায় বহমানা। সে নদীতে আবর্ত্ত, তরঙ্গ, উচ্ছ্বাস কিছুই নাই। সাধারণে তাহার গতি বুঝিতে পারে না এবং তিনিও তাহা বুঝাইতে ইচ্ছা করেন না। সেই পবিত্র-প্রবাহিনীর, যে অংশ সংসারে সংযুক্ত, সাধারণে সেই বাহ্যপ্রকৃতি মাত্রই দেখিতে পায়। সংসারীর হৃদয় সর্ব্বদাই সন্দিগ্ধ, সর্ব্বদাই আবিল, কাযেই তাহার প্রকৃত তত্ত্ব কেহই পায় না। সেই মহৎপ্রকৃতি, প্রায়, চিরদিনই মানবসমাজের অনধিগম্য থাকিয়া যায়। তাঁহার সহিত মনুষ্যসাধারণের যতটুক সম্বন্ধ, তাহাও স্বার্থপরতাদি-বৃত্তিশীল সংসারী, অনেক সময় বুঝিয়া উঠিতে পারে না। এরূপ সহস্র সহস্র ধর্ম্মজীবন, নিগূঢ়ে বহিতেছে। শাকান্ন-ভোজী দরিদ্র কুটির হইতে, ধনীর সুরম্য প্রাসাদে, এতাদৃশ শত শত নরনারী, আপনার তপস্যা, আপনার কার্য্য, নীরবে সম্পাদন করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। কিন্তু, তাঁহাকে কেহই চিনিতে পারে না। কত শত দুরাত্মা, প্রকাশ্যে কিছু দান,—দুটী সৎকার্য্য করিয়া ধন্য ধন্য হইতেছেন।—কত পাপাত্মা, কত

কুলটা, আপনার তুর্নাম ঢাকিবার জন্য দানশীলা হইতেছেন।—কর্ম্মচারী-দিগের কৌশলে, সংবাদপত্রে "পুণ্যবতী" "প্রাতঃস্মরণীয়া" ইত্যাদি নামে খ্যাতিলাভ করিতেছেন। কিন্তু কত কত মহাত্মা, কত কত তপস্বিনী, দরিদ্রের গৃহে,—আর্য্যজাতির গুপ্ত অন্তঃপুরে জন্মিয়া আপনার মহত্ব,—আপনার সাধনা, শম, দম, ক্ষমা, তিতিক্ষাদি গুণে, আপনি উপবাসী থাকিয়া, মুখের গ্রাসে ক্ষুধিতের ক্ষুধা নিবারণ করিতেছেন,—আপনার সর্ব্বস্ব দান করিতেছেন, সাধারণে তাহার সন্ধানও রাখে না। সংসারের এই বিচিত্র ব্যাপার দেখিয়া, মহাকবি কালিদাস এবং তাঁহার প্রতিযোগী দরিদ্র কবি ঘটকর্প্পরের তুইটী কবিতা মনে হয়। কালিদাস, কুমার সম্ভবের আরম্ভে, হিমালয়ের নানা গুণের মধ্যে, অসহ্য হিমপাতরূপ একটী দোষের এইরূপ নিষ্পত্তি করিয়াছেন, যে—

"—একোহি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।"

এই প্রয়োগের ছায়া লইয়া ঘটকর্প্পর, বড় তুঃখেই বলিয়া ছিলেন—

একোহি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীতি কবিরপ্রভাষে
নূনং নদৃষ্টং কবিনাপিতেন
দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী।"

দরিদ্র কবির গভীর তুঃখের উক্তিতে, অমূল্য সত্য নিহিত আছে। পৃথিবীতে, দানাদি সৎকর্ম্মশীল কত শত ধর্ম্মাত্মা,—প্রকৃত ত্যাগী, প্রকৃত মহাত্মা, দারিদ্র্যের আবরণে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন। তিনি স্বয়ং আত্ম-প্রকাশ না করিলে, কেহ তাঁহাকে চিনিতেও পারে না।

চতুর্থ শ্রেণীর মহাত্মারা, স্বদেশ প্রেমিক বীর। তাঁহারা, আপনার

দেহ, স্বজাতির জন্য—স্বদেশের জন্য, উৎসর্গ করিয়া থাকেন। সংসারে কোনও অত্যাচার দেখিলেই ব্যাকুল হন। তাঁহারা, আপনার অস্তিত্ব ভুলিয়া, পরের নিমিত্ত জীবন উৎসর্গ করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। কিন্তু আমরা এখন, তাঁহাদের পবিত্র নাম লইতেও অনধিকারী। তবে, স্বাধীন জাতির নিকট ইহাঁরা, পরমারাধ্য দেবতা। অতএব তাঁহাদের জীবন-বৃত্তও সমাজে প্রয়োজনীয়।

প্রস্তাবিত চারি শ্রেণীর মহাত্মার চরিত্র আলোচনায় কি বুঝিলাম? তদুত্তরে সংক্ষেপে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, প্রথমোক্ত জন, ব্যক্তরূপা প্রকৃতি জড়িত, অব্যক্তরূপ পুরুষের আরাধনা করেন। তিনি, আপনার উৎকর্ষের সঙ্গে, জগতের উন্নতিতেও ক্ষিপ্র হস্ত। দ্বিতীয় জন, কেবল ব্যক্তরূপা প্রকৃতির সেবক। অব্যক্তরূপে তিনি চিত্ত সমাধান করিতে পারেন না। তাঁহার আপনার সাধনা সংকীর্ণ হইলেও, জগতের উপকারে ক্ষান্ত নহেন। তৃতীয় জন, অব্যক্ত পুরুষেই জীবন অর্পণ করিয়া কৃতার্থ। তিনি, ব্যক্তরূপা প্রকৃতিতে, অব্যক্তরূপ জগদীশ্বরকে, স্ফাটিকে রক্ত পুষ্পের আভা সম্পাতের ন্যায় দর্শন করেন।—আপনার ছায়া সর্ব্বভূতে দেখেন, জগতকে ভাল বাসেন। কিন্তু তাহাতে লিপ্ত হইতে কিম্বা জগতে আত্ম প্রকাশে অনিচ্ছুক। চতুর্থ জন, প্রকৃতির মূলতত্ত্বে লক্ষ্য রাখিয়া, সংসারকে সুসংযত করিতে যত্নশীল। তাঁহার লক্ষ্য সাধনে,—স্বজাতির হিতের জন্য, অতি তুচ্ছ কারণেও তিনি জীবন দান করিতে পারেন।

যাঁহার জীবন চরিত উপলক্ষে, এই ভূমিকার সূত্রপাত করা গিয়াছে, বোধ হয়, তিনি, তৃতীয় শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট হইবার যোগ্য। তাঁহার বহিরাবরণ দেখিয়া তাহাই উপলব্ধি হয়। আর তাঁহার পতি-দেবতা, রাজা যোগেন্দ্র নারায়ণ, চতুর্থ শ্রেণীর হৃদয় লইয়া এই পরাধীন দেশে

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পাঠকগণ, সমস্ত বৃত্তান্ত পাঠ করিলেই, তাহা বুঝিতে পারিবেন। যোগেন্দ্রনারায়ণ যদিও অল্পবয়সে,—অতৃপ্ত-জীবনে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার প্রকৃতির ছায়া, যাহা, এই পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতেই বুঝা যাইবে যে, শরৎসুন্দরী, অতি যোগ্য পতি লাভ করিয়াছিলেন।

এখন লেখক লইয়া সমস্যা। জীবন চরিত, বহু প্রকারে লিখিত হইলেও সচরাচর দুই প্রণালীর সঙ্কলন পদ্ধতিই প্রধান। প্রথম প্রণালীতে, কেবল নায়কের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত, ঘটনাসকল পর্য্যায় ক্রমে লিখিত হয়। পাঠকেরা তাহা পাঠ করিয়া, সার সঙ্কলন করিয়া লইতে পারেন। আর, নায়কের কার্য্য পরম্পরার সঙ্গে সঙ্গে, হৃদয়ের গূঢ়তম ভাব প্রস্ফূটন করা, অন্য শ্রেণীর চরিত লেখকের রীতি। ইহাতে লেখকের উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও, কবিত্বে কিছু না কিছু, কল্পনার ছায়া পড়িতে পারে। সুতরাং প্রকৃত চরিত্র বুঝিতে, পাঠকের ভ্রান্তি জন্মা অসম্ভব নহে। উপস্থিত লেখকের সেরূপ বিদ্যা বুদ্ধির অভাব; তাহার পক্ষে দুই প্রণালীই দুঃসাধ্য। তবে, তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে, যতদুর সম্ভব, প্রস্তাবিত দ্বিবিধ উপায়ের মধ্যবর্ত্তীতায় লিখিতে প্রয়াশ পাইয়াছে। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহা পাঠকেরা বিচার করিবেন।

এস্থলে, পাঠকগণের সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া,উপসংহার করিতে পারিতেছি না। ভরসা করি পাঠকেরা লেখকের এই ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন।

পাঠকদিগের মধ্যে সম্ভবতঃ তিন শ্রেণীর লোক আছেন। পল্লবগ্রাহী, কুসুমগ্রাহী এবং ফলগ্রাহী। পল্লবগ্রাহী পাঠক, চরিতরূপ বৃক্ষের পাতাগুলির সজ্জার ত্রুটি দেখিলে, তাহার মূল পর্য্যন্ত তত্ত্ব করিবার ধৈর্য্যধারণে অশক্ত। ফলাস্বাদন ত বহু দূরের কথা; সুতরাং পুস্তকের দুই চারি পৃষ্ঠা উল্টাইয়া, লেখকের অন্তেষ্টি ক্রিয়া করিয়াই,

প্রত্যাবৃত্ত হন। কুসুমগ্রাহী পাঠক, পত্রের প্রতি লক্ষ্যও করেন না। কুসুমের গন্ধে মুগ্ধ হইয়া, দুই একটী ফুল তুলিয়া হৃদয়ে রাখিলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়, সংসারের বিষাক্ত ঝঞ্ঝায় জ্বালতন, সুতরাং ফুলগুলি অল্প-ক্ষণেই বিকৃত এবং বিশুষ্ক হইয়া যায়। অতএব,তাঁহার পুষ্পাহরণেই দিন যায়, ফল দেখিবার অবসর হয় না। প্রকৃতপক্ষে, ফলগ্রাহী পাঠকদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়। তাঁহারা, ধৈর্য্যের সহিত, মূল হইতে শীর্ষ পর্য্যন্ত বৃক্ষটী দেখিয়া লন, মালীকে লক্ষ্যও করেন না। বৃক্ষটী কি জাতীয়, কি কি গুণ আছে, আর ফলই বা কিরূপ উপকারী, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখেন। পরে ফলের রসাস্বাদন অন্তে আপনার হৃদয়ে বীজ রোপণ করিয়া থাকেন। যত্ন প্রায়শঃ নিষ্ফল হয় না। সেই বীজ, কালে মহাবৃক্ষে পরিণত হয়। তাহার ছায়ায় কত সন্তাপী, শান্তি পায়, ফলাস্বাদনে কত ব্যাধিগ্রস্তের রোগ নাশ হয়। অতএব, পাঠকেরা ধৈর্য্যশীল হইলে অযথা সঙ্কলিত বলিয়া, বোধ হয়, এই পবিত্র চরিত্রের মূল পবিত্রতার অপক্ষপাতী হইবেন না।

ইহার পরে জীবন-চরিত লেখকের, আর একটী প্রমাদ আছে। যিনি, অল্পদিন মাত্র দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার জীবন বৃত্তান্তের সংস্পৃষ্ট অনেকেই প্রায় জীবিত থাকেন। নায়কের চরিত্র বিকাশ করিতে, সম্ভবতঃ কেহ, মনে ব্যথা পাইতেও পারেন। কাহাকেও বা ঘোর কলঙ্ক-গ্রস্ত হইতেও হয়। তাহাতে সত্যের সারল্য থাকিলেও, লেখক যে প্রমাদ গ্রস্ত, তাহা বোধ হয়, কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। তদ্ভিন্ন, পরাধীন দেশের লোকে, চতুর্থ শ্রেণীর মহাত্মার জীবন-চরিত লিখিতে, কিম্বা লোক-জগতে, তাঁহার হৃদয়ের গুহ্যভাব প্রকাশ করিতে, সম্পূর্ণ অপারগ। আর সেই শ্রেণীর পূর্ণ জীবন, ভারতবাসী কোনও কালে প্রত্যক্ষ করিবেন কিনা, তাহা বিধাতাই জানেন।



মহারাণী শরৎসুন্দরীর

জীবন-চরিত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বরেন্দ্র-ভূমি, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজ, বাল্য-জীবন, শিশুশিক্ষা-প্রণালী।

যবনরাজাদিগের অধিকারকালে রাজসাহী বিভাগের বিস্তৃতি, অপেক্ষাকৃত অনেক বৃহৎ ছিল। কিন্তু, তৎকালে এই ভূভাগের কোন একটী স্থানও রাজসাহী বলিয়া পরিচিত ছিল না।* প্রাচীনকালে এই বিভাগই প্রকৃত বরেন্দ্র-ভূমি, এবং তাহার অধিবাসী ব্রাহ্মণেরা "বারেন্দ্র শ্রেণী" নামে প্রসিদ্ধ। চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে বরেন্দ্র-ভূমির ভৌগোলিক আকার বহু বিস্তৃত ছিল। সম্রাট আকবরের সময়ে রাজস্বমন্ত্রী রাজা তোড়রমল্ল, যে সকল "সরকার" নামক বিভাগে বঙ্গ-

* নাটোরের বিখ্যাত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রঘুনন্দন, যে সময়ে বঙ্গের নবাব নাজিমের মন্ত্রী ছিলেন, সেই সময়ে তিনি, প্রথমে রাজসাহী পরগণা, তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর রাজা রামজীবনের নামে বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন, এবং তাহাই তাঁহার ভাগ্যপরিবর্ত্তনের সূত্রপাত। তাহাতেই নাটোর বংশ, রাজসাহীর রাজা বলিয়া বিখ্যাত। এক সময়, রঘুনন্দনের ভাগ্যবলে বঙ্গদেশের প্রায় একচতুর্থাংশ, নাটোর বংশের শাসনদণ্ডে পরিচালিত হইয়াছিল। তজ্জন্যই বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রথম অধিকারকালে, নাটোরকে "রাজসাহী" নামে অভিহিত করিয়া জেলা স্থাপিত হয়। বাস্তবিক পক্ষে রাজসাহী পরগণা, এখন বীরভূম জেলায় সন্নিবেশিত আছে।

দেশকে বিভক্ত করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে সরকার বার্ব্বকাবাদ এবং সরকার পঞ্জারা প্রভৃতি লইয়া, কতকগুলি পরগণাতে বরেন্দ্র-ভূমির আয়তন। উহা, বঙ্গের প্রসিদ্ধ দ্বাদশ ভৌমিকের * মধ্যে তাহিরপুর ও সাঁতুলের ভৌমিকদ্বয়ের শাসনাধীনে ছিল। † তাহিরপুর ও সাঁতুলের ভৌমিকরাজাদ্বয়ের অধিকার ব্যতীত, এই বিভাগে চৌধুরী নামক দুই একটী নিরীহ জায়গীরদারও ছিলেন। ‡ আচার, ব্যবহার এবং ভাষার ঘনিষ্ঠতা, যে, বৃহৎ নদনদী এবং বিল আদির পরিচ্ছেদে ঘটিয়া থাকে, বরেন্দ্র-ভূমির বহির্ভাগও তাদৃশ প্রাকৃতিক রেখায় বিচ্ছিন্ন ছিল। ইহার উত্তরদিকে দিনাজপুর ও রঙ্গপুর জেলার একটী সুদীর্ঘ বনবিভাগ। § পূর্ব্বদিকে দুস্তর বিল-চলন, বিল-বকরী এবং করতোয়া নদীকে নির্দ্দেশ

* তাহিরপুর, সাঁতুল, যশোহর (যে স্থানে রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ছিল), ভাওয়াল, বিক্রমপুর, সুসঙ্গ, ভূষণা (যশোহর জেলায়), চন্দ্রদ্বীপ (বাকলা চন্দ্রদ্বীপ), ভুলুয়া, খিজিরপুর (নারায়ণগঞ্জের নিকট) এবং দিনাজপুর এই একাদশটী ভৌমিকের সন্ধান পাওয়া যায়।

† এই ভৌমিকদ্বয়ের বংশ এককালে লোপ পাইয়াছে। সাঁতুলবংশের শেষ রাণী সর্ব্বাণীর মৃত্যুর পর, তাঁহার সম্পত্তি ভাতুড়িয়া প্রভৃতি, রাজা রঘুনন্দনের হস্তগত হইয়াছিল। আর তাহিরপুরের বিখ্যাত রাজা কংসনারায়ণের বংশের নিদর্শন তাহিরপুর পরগণার ৷৶৹ আনা অংশ, এই বংশের রাজা রণেন্দ্রনারায়ণ রায়ের ছিল। তাঁহার অভাবে তদীয় অবিবাহিতা কন্যা উমাদেবী ও তৎপর তাঁহার পতি আনন্দরাম রায়ের ভ্রাতা, বুদ্ধিমান ও প্রতিভাশালী বিনোদরাম রায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এবং তিনিই বর্ত্তমান তাহিরপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। অবশিষ্ট ।৶৹ আনা অংশ, নানা কারণে হস্তান্তরিত হইয়াছে। সেই অংশে একটী দত্তক পুত্র ছিলেন; অল্পদিন পূর্ব্বে তাঁহারও অভাব হইয়াছে।

‡ প্রবাদ আছে, বঙ্গদেশে, সে সময়ে দ্বাদশ ভৌমিক ব্যতীত চৌদ্দ চৌধুরীও প্রবল ছিলেন। তাহার মধ্যে, রাজসাহী জেলায় কাশীমপুরের চৌধুরীগণ ভিন্ন, আর কোন চৌধুরী বংশের প্রাচীনত্বের নিদর্শন পাওয়া যায় না। উক্ত জেলায় ডাঙ্গাপাড়ার কায়স্থ চৌধুরীগণও আপনাদগকে চৌদ্দ চৌধুরীর একতর বংশীয় বলিয়া থাকেন।

§ উত্তর বঙ্গ রেলওয়ের হিলি ষ্টেশনের পশ্চিম হইতে মালদহ জেলার নিতপুরের জলাভূমি, এবং ঐ ষ্টেশনের পূর্ব্ব হইতে ময়মনসিংহ জেলার সুসঙ্গের পার্ব্বত্য প্রদেশ পর্য্যন্ত একটী কাল্পনিক রেখা টানিলেই, বরেন্দ্র ভূমির উত্তর সীমা কল্পিত হইতে পারে। এই রেখার মধ্যে এখনও শালবন এবং বিল, খাল বিস্তর আছে।

করা যাইতে পারে। * দক্ষিণে মহানন্দা ও পদ্মানদী। এবং পশ্চিমে মহানন্দানদী ও প্রাচীন গৌড়ের ভগ্নস্তূপের নিদর্শন, মালদহ জেলার পূর্ব্বভাগ। এই বিস্তৃত ভূখণ্ডের মধ্যে স্থানে স্থানে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের প্রাচীন সমাজসকলের চিহ্ন এখনও দেখা যায়।

রাজসাহী জেলার বর্ত্তমান আয়তন, সঙ্কীর্ণ হইলেও অনেক স্থানে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষদিগের বসতিচিহ্ন, অদ্যাপি লুপ্ত হয় নাই। † দুঃখের বিষয় এই যে, বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা সম্প্রতি এই বিভাগের ব্রাহ্মণের সংখ্যা অতি সামান্য। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, যে, যবনরাজত্বের সময়, দুই চারিজন বীর্য্যবান্ ব্রাহ্মণ-সন্তান, রাজকার্য্যে প্রতিপত্তি লাভ করিয়া দেশের মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ জায়গিরের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের আধিপত্যে, নিরীহ মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণেরা পৈতৃক আবাস ত্যাগ করিয়া, পদ্মা নদীর উত্তর ও পূর্ব্বতীরে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তবে কেবল জায়গিরদারদিগের আসন্ন কুটুম্ব, অথবা অন্যান্য কর্ম্মোপলক্ষে যাঁহারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদিগের বংশপরম্পরা এবং তাঁহাদের আত্মীয় কুটুম্ববংশে রাজসাহীর বর্ত্তমান ব্রাহ্মণসমাজের গঠন। পক্ষা-

---

* করতোয়া অতি প্রাচীনা নদী। কিন্তু এখন ইহার চরম দশা উপস্থিত। বিলচলনের পশ্চিম পারে করতোয়া বড়াল নদীর সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

† কুলজ্ঞগ্রন্থে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের যে সকল সমাজের উল্লেখ আছে, তাহার অধিকাংশই বর্ত্তমান রাজসাহী জেলার সীমামধ্যে দেখা যায়। তবে, দীর্ঘকালে নামের অপভ্রংশ মাত্র হইয়াছে। যথা,—মধ্যগ্রাম (মাঝগ্রাম) গুড়নদী (গুড়নই) গুণিগাছা, ভাদুড়ী (ভাতুড়িয়া) মধুগ্রাম (মৌগ্রাম) বালযষ্টিক (বালশাটীয়া) মঠগ্রাম (মঠগাঁ) গঙ্গাগ্রাম (গাঙ্গইল) বিশাখ (বিশা) রাণীহারি (রায়না) কুড়মুড়ি (কুড়মইল বলিহার) শীতলী (শীতলাই) তালড়ী (তানোর) দেবলী (দেউলা) নিদ্রালী (নিন্দইল) কালিগ্রাম (কালিগাঁ) খর্জ্জুরী (খাজুরিয়া) পঞ্চবটী (পাঁচবাড়িয়া) চম্পটী (চামটা) বোড়গ্রাম (বড়াইগাঁ) করঞ্জ (করঞ্জা) বোথুড়ী (বোথড়) ইত্যাদি নাম ও সমাজের চিহ্ন দেখা যায়।

স্তরে, জায়গিরদারেরা যতই কেন ক্ষমতাশালী হউন না, যবন রাজত্বের শেষ সময়ে দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয় বারগির * ও ভোজপুরিয়া দস্যুদিগের হস্তে কাহারই নিস্তার ছিল না। ইহারা বিপুল সেনাসমাবেশের সহিত যোদ্ধৃবেশে দস্যুতা করিত। সুতরাং এই সকল প্রবল শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য, বঙ্গদেশের প্রাচীন ভূম্যধিকারিগণ, প্রকৃতির স্বাভাবিক দুর্গস্বরূপ, বন ও জলাকীর্ণ ভূভাগে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রাজসাহীর মধ্যে দুলর্ঙ্ঘ্য পরিখাস্বরূপ পদ্মানদী থাকিলেও, অবারিত স্থান বলিয়া, তাহার তীরে কোন সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি বাস করিতেন না। তাহাতেই এ অঞ্চলে পদ্মাতীরে গণ্ডগ্রাম কি নগরের চিহ্ন দেখা যায় না। বর্ত্তমান বোয়ালিয়া নগরীতে ৭০ বৎসরের পূর্ব্বে, দুই চারি ঘর রেসমব্যবসায়ী ব্যতীত, কোন ভূম্যধিকারীর নিবাসচিহ্ন লক্ষিত হয় না। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ওলন্দাজেরা বোয়ালিয়াতে একটী কুঠী নির্ম্মাণ দ্বারা, রাজসাহী অঞ্চলে রেসমের ব্যবসায় আরম্ভ করেন। পরে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী, এই কুঠী ওলন্দাজদিগের নিকট ক্রয় করেন। সংপ্রতি তাহা "বড়কুঠী" নামে, ওয়াট্‌সন কোম্পানীর সম্পত্তি।

প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে বোয়ালিয়ার দুই ক্রোশ দক্ষিণে, মহানন্দা নদী বহমানা ছিল। তাহার অনেক দূর দক্ষিণে পদ্মানদী প্রবাহিত হইয়া সরদহের নিকট, উভয় নদীর সংযোগ হইয়াছিল। কালের পরিবর্ত্তনে মহানন্দা ও পদ্মা এক হইয়া, বোয়ালিয়ার পূর্ব্ব অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়াছে। প্রস্তাবিত কুঠীর অব্যবহিত পূর্ব্ব দিক দিয়া,

* পারস্যভাষায় বারগির শব্দে অশ্বারোহী বুঝায়। মহারাষ্ট্র দস্যুরা অশ্বারোহণে বিশেষ পারদর্শী। তাহারা অশ্বারূঢ় হইয়া অতি দ্রুতবেগে, পার্ব্বত্য বন্ধুর পথসকল যেরূপে উত্তীর্ণ হইতে পারিত, ভারতবর্ষের কোনজাতিই তাহার অনুকরণে ক্ষমবান্ ছিল না। এই বারগির দস্যুগণ, বর্ত্তমান নাগপুর প্রদেশের দুর্গম বনাকীর্ণ গিরিপথ, অতিক্রম করিয়া উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশে আপতিত হইয়া দস্যুতা করিত। এদেশে তাহারাই "বর্গী" নামে প্রসিদ্ধ।

বারাহী নদী * বাহির হইয়া, তাহিরপুরের নিকট দিয়া, তেমুখ গ্রামে, আত্রেয়ী নদীর সহিত মিলিত ছিল। তাহার কিছু পূর্ব্ব দিকে নারদ নদ, মহানন্দা হইতে বাহির হইয়া, পুঠিয়া ও নাটোর রাজধানীর দক্ষিণ দিয়া নন্দকুজার সহিত মিশিয়াছে। পুঠিয়ার পূর্ব্বদিকে পাইকপাড়ায় একটী নালা, বড়াল নদী এবং হোজা নদীকে সংযুক্ত করিয়াছিল। ঐ নালার দক্ষিণ-পূর্ব্বভাগকে মুষাখাঁ বলিয়া থাকে। ১২৪৫ বঙ্গাব্দের বর্ষায়, মুষাখাঁ বিস্তৃত হইয়া, রাজসাহীর দক্ষিণ-পূর্ব্বভাগে পদ্মার প্রবল জলে, একটী ঘোর বিপ্লব হয়। † সেই হইতে মুষাখাঁ ও হোজা, একত্র হইয়া গদাই নামে অভিহিত হইয়াছে। দক্ষিণে নারদ, পূর্ব্বে মুষাখাঁ, উত্তরে হোজা, এই নদীত্রয়ের বেষ্টনের মধ্যে, রাজসাহী জেলার প্রধান নগর রামপুর বোয়ালিয়ার ৮ ক্রোশ পূর্ব্বদিকে পুঠিয়া গ্রাম। বারেন্দ্র শ্রেণীর প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ ভূম্যধিকারীবংশের বসতির জন্য পুঠিয়া বিখ্যাত। চতুর্দ্দশ খৃষ্টাব্দের শেষ, অথবা পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দের প্রথমেই পুঠিয়া রাজধানীর গঠন হয়। এই গ্রামে, রাজধানীর সংস্রবে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য এবং গোপ ইত্যাদি নবশাখের পুরুষানুক্রমিক বসতি আছে।

এই পুঠিয়া গ্রামে ভৈরবনাথ সান্যালের বাস। ভৈরবনাথের পিতামহ

---

* বারাহী, এখন বারানই নামে প্রসিদ্ধ। এই বারাহী নদীর পূর্ব্বতীরে রামরামা গ্রামে তাহিরপুরের বিখ্যাত ভৌমিক বংশের রাজধানী ছিল। বারাহী এখন নিতান্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রামরামার পশ্চিমে বারাহীর অপর পারে তাহিরপুরের বর্ত্তমান রাজবাটী।

† রাজসাহীবাসী বৃদ্ধগণ, এই বর্ষার প্রভাব এখনও বর্ণনা করিয়া থাকেন। একরাত্রি মধ্যে মুষাখাঁ বিস্তৃত হইয়া এই ভূভাগের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন করিয়াছে। চলন, চন্দ্রাবতী, হালতী, রামসার প্রভৃতি দুস্তর জলাকীর্ণ বিল সকল, এই ৫০ বৎসর মধ্যে মৃত্তিকাপূর্ণ হইয়া লক্ষ লক্ষ লোকানিবাসে পরিণত হইয়াছে।

হরিনাথ সান্যাল, এই জেলার সিংড়া থানার নিকটবর্ত্তী তাজপুর গ্রাম হইতে আসিয়া এখানে বাস করেন। * ১৭৭১ শকে (১২৫৬ সালে) ২০শে আশ্বিনে ভৈরবনাথের ঔরসে, দ্রবময়ী দেবীর গর্ভে, শরৎসুন্দরী জন্মগ্রহণ করেন। ভৈরবনাথের পুত্র সন্তান, ছিল না বলিয়া, শরৎ-সুন্দরী, পিতা মাতার পরম আদরের পাত্রী হইয়াছিলেন। শরৎসুন্দরীর জন্মের অনেক দিন পর, ভৈরবনাথের শ্রীসুন্দরী নামে আর এক কন্যা জন্মিয়াছিল। সম্পত্তির গৌরবে ভৈরবনাথের প্রতিপত্তিও সামান্য ছিল না। তৎকালে তাঁহার বংশভূষণ একমাত্র কন্যা শরৎসুন্দরী। অতএব, শরৎসুন্দরী, পিতা মাতার সম্ভবাতীত স্নেহপাত্রী ছিলেন। এরূপ স্নেহে—এরূপ আদরে ধনীকন্যাগণ, স্বভাবতঃ কিছু গর্ব্বিতা হইয়া থাকেন। কিন্তু, শরৎসুন্দরীর প্রকৃতি, সেরূপ উপাদানে নির্ম্মিত ছিল না। এই লোক-ললামভূতা বালিকার ভবিষ্যৎ চরিত্রের বীজ, যেন, অক্রুবাণাবস্থাতেই অঙ্কুরিত হইয়াছিল। জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই, তাঁহার সর্ব্বলোকপ্রিয়তা এবং মহত্ত্বের প্রভা প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার পঞ্চমবর্ষ বয়সেই, বিনয়, পর-দুঃখকাতরতা ও সত্য-নিষ্ঠার মধুরিমা, প্রত্যেক কার্য্য এবং চেষ্টাতেই প্রকাশ পাইত। তাঁহার অলোক-সাধারণ শৈশব-চরিত পর্য্যালোচনা করিলে, প্রস্তাবিত গুণসমূহকে প্রাক্তনসংস্কারজ না বলিয়া উপায় নাই।

* পুঠিয়ার রাজাদিগের ।১৩।/ ক্রান্তির (সকলে ইহাকে চারি আনির তরফ বলিয়া থাকে) অংশী রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে, হরিনাথের কন্যা সূর্য্যমণি দেবীর বিবাহ হয়। সূর্য্যমণি, অতি অল্প বয়সে বিধবা হইয়া, পতির ত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছিলেন। তিনি এক জন বুদ্ধিমতী ও রাজকার্য্য-কুশলা মহিলা বলিয়া প্রশংসিতা ছিলেন। হরিনাথ, কন্যার অনুরোধে, পূর্ব্ব নিবাস পরিত্যাগ করিয়া পুঠিয়ায় বাস করেন। তিনি, পূর্ব্বে এক জন সামান্য গৃহস্থ থাকিলেও, বুদ্ধিমতী কন্যার অনুগ্রহে অল্পদিন মধ্যে মাধ্যমিক ভূম্যধিকারীর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন।

শিক্ষা এবং সংসর্গ-জনিত দোষ ত্যাগ করিয়া, গুণগ্রহণে পটুতা লাভ করা, পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকার পক্ষে কঠিন। আবার, মূল-প্রকৃতির পবিত্রতা না থাকিলে, কেবল শিক্ষা কিম্বা সংসর্গে হৃদয়ের নির্ম্মলতালাভও দুঃসাধ্য। অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে, সুবীজ বপন করিলেও, সতেজ বৃক্ষ হয় না; আর, উর্ব্বর ক্ষেত্রে, অসার বীজেও কোন ফল হয় না। কিন্তু, উর্ব্বর ক্ষেত্রে পুষ্ট অপুষ্ট মিশ্র বীজ ছড়াইলে, অপুষ্ট বীজে কিছু না হইলেও, অল্পমাত্র পুষ্ট বীজেই অনেক উপকার হয়। মানবের হৃদয়ক্ষেত্রেও সেরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

সকল পরিবারেই অল্প বিস্তর, সদসৎ, উভয়প্রকৃতির মনুষ্যই দেখা যায়। অথচ পরিবারস্থ শিশুগণ, একই পরিবারমণ্ডলীর মধ্যে পালিত হইয়া, কেহ ভাল, কেহ মন্দ কেন হয়? ইহার তত্ত্বানুসন্ধান করিলেই, প্রত্যেক শিশুর ভিন্ন ভিন্ন প্রাক্তনজ মূলপ্রকৃতির প্রভাব মানিতে হয়। ধনী সন্তানগণ, প্রায়শঃই আবিলচরিত্র দাসদাসীর রক্ষণে বাল্যজীবন অতিবাহিত করেন। সুতরাং রক্ষকদিগের হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা, দ্বেষ, হিংসা, কপটতা, লোভ, ভ্রান্তি, মিথ্যাভাষণ ইত্যাদি দোষগুলি, যে, তাহাদের রক্ষণাধীন শিশুদিগের হৃদয়ে সহজে অনুস্যূত হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? বালিকা শরৎসুন্দরীর পক্ষে, তাদৃশ রক্ষকের অভাব ছিল না। বরং পিতামাতার স্নেহাধিক্যে, তাঁহার যথেচ্ছাচারের বিস্তর সুযোগ ছিল। কিন্তু,মূলপ্রকৃতির নির্ম্মলতায়, তিনি, অপোগণ্ড অবস্থাতেও, নানাকার্য্যে ভবিষ্যজীবনের স্ফুটোন্মুখ পবিত্রতায়, সকলকে মুগ্ধ করিতেন। যেন আপনার হৃদয়ই তাঁহার প্রকৃত শাসক ছিল।

স্বর্ণকণামিশ্রিত ধূলিতে, পারদ সঞ্চালন করিলে, পারদ যেমন, ধূলায় নির্লিপ্ত থাকিয়াও স্বর্ণরেণুগুলি সংগ্রহ করে, সেইরূপ প্রাক্তনসম্ভূত পবিত্র মূলপ্রকৃতিও, সদসৎ প্রকৃতির লোকের নিকট হইতে দোষবর্জ্জন করিয়া

সদাচার সমূহই গ্রহণ করিয়া থাকে। ফলতঃ, এরূপ মূলপ্রকৃতির প্রতিভা জগতে দুর্লভ। সেই জন্যই আজন্ম-শুদ্ধ-চরিত্রবান্ লোকও অল্পই দেখা যায়। সেই সুপবিত্র প্রকৃতিবলে পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকাকে কোনও প্রকার কুসংসর্গেই আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তাঁহার মূলপ্রকৃতির অঙ্কুরেই, অব্যক্ত মহত্ত্ব ছিল। ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, দয়া, লজ্জা, ক্ষমা, পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ, আত্মপ্রতিভার ক্ষীণজ্যোতিতে মিশিয়া তাঁহার বালিকাস্বভাবেই বিরাজ করিত।

এখন শিশুদিগের চরিত্রগঠন লইয়া অনেক আন্দোলন চলিতেছে। ফলতঃ, সন্তানদিগের চরিত্রগঠন সম্বন্ধে, পিতামাতাগণই প্রথমে দায়ী। তাহার মধ্যে আবার জননীরূপিণী গৃহলক্ষ্মীদিগের, গুরু দায়ীত্ব বুঝিয়া বড়ই সাবধান হইতে হয়। সেইজন্য, শিশু-চরিত্র সম্বন্ধে এইস্থলে দুই চারিটী কথা বলা, বোধহয়, অবৈধ হইতেছে না।

শিশুদিগের অক্রুবাণ অবস্থা হইতেই, তাহাদের চরিত্র গঠনের চেষ্টা করা উচিত। সেই সময়ে অভিভাবকগণ অমনোযোগী হইলে, শিশুদিগের ভবিষ্য-জীবনের পবিত্রতা দুরাশা মাত্র। নানা দুর্লোভ-সঙ্কুল সংসারে অনেক পরিণতবয়স্ক লোকেই চরিত্র রক্ষা করিতে অসমর্থ; তাহাতে সুকুমারমতি তরল-প্রকৃতি শিশুদিগের সম্বন্ধে কত কঠিন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। অক্রুবাণ শিশুদিগের প্রত্যেকের চেষ্টা ও কার্য্য সকল, নিপুণতার সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিলে, তাহাদের ভবিষ্য স্বভাবের চিত্র অনেক দূর বুঝা যায়। শিক্ষা ও সংসর্গে, বয়োন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার রূপান্তর না হইলেও, অনেক অংশে বিকৃত হইবার সম্ভাবনা। যে দুই চারিজন মহাত্মা, আপনার গুণেই জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। অনেক দূরদর্শী বিজ্ঞলোকের বিশ্বাস যে, অভিভাবকগণ, শিশুদিগের কথা ফুটিবার সময় হইতে, ধীরে ধীরে

চেষ্টা করিলে, দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির শিশুকেও শান্ত ও সচ্চরিত্র করিতে পারেন।

অক্রুবাণাবস্থাতেই কোনও শিশু বিনীত, কেহ বা, দারুণ উদ্ধত স্বভাবের পরিচয় দিয়া থাকে। দুই বৎসর বয়সের বালক বালিকার মধ্যে, কেহ স্বহস্তগত খাদ্য অন্যকে দিতে, কেহবা অপরের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেও কুণ্ঠিত হয় না।—কেহ দৌড়াদৌড়ি করিতে, অন্যকে আঘাত করিতে সুখবোধ করে; কেহ বা শান্তভাবে খেলা করিতে, অকুণ্ঠিতচিত্তে অন্যের উৎপীড়ন সহ্য করিতে ধৈর্য্যশীল। কোনও শিশুর মুখে সর্ব্বদাই হাস্য বিরাজ করে,—নৃশংস কার্য্য দেখিলে সকরুণে রোদন করিয়া আকুল হয়; আবার কেহ নৃশংস কার্য্য দেখিয়া সুখী হয়, হাসি দূরের কথা, তাহার মুখের সুকুমার ভাবের মধ্যেও,কুটিলতার ছায়া লক্ষিত হয়। কেহ সাধারণ ক্রীড়ার সামগ্রীতেই পরিতুষ্ট; নিতান্ত কষ্ট না পাইলে প্রায় রোদন করে না। কেহবা উগ্রমূর্ত্তিতে ক্রীড়ার দ্রব্যগুলি নষ্ট করে, গৃহের সামগ্রী অপচয় করে; উগ্রভাবের খেলায়,—উচ্চণ্ড ব্যবহারে সর্ব্বদাই সকলকে বিরক্ত করে।—কথায় কথায় অভিমান, কথায় কথায় জেদ করিয়া থাকে। অতি সামান্য কারণে ক্রোধে অধীর হইয়া বিরক্তিকর রোদনে প্রতিবাসীকে পর্য্যন্ত জ্বালাতন করে *। প্রস্তাবিত

* প্রাচীন সময় হইতে, কোন কোন স্থানে শিশুদিগের মূলপ্রকৃতি পরীক্ষার একটী পদ্ধতি, অদ্যাপি প্রচলিত দেখা যায়। শিশুর অন্নপ্রাশনের দিন, তাহার সম্মুখে কলম, কালী, টাকা, ধান, এবং একখান অস্ত্র রাখা হয়। শিশু, প্রথমে তাহার মধ্যে যে দ্রব্যে হস্ত প্রদান করে, অভিভাবকেরা সেই দ্রব্যকে, তাহার ভবিষ্য জীবনের অবলম্বন বলিয়া, বিবেচনা করিয়া থাকেন। ইহার মূলে অন্য কোন গূঢ় উদ্দেশ্য থাকিলেও থাকিতে পারে; কিন্তু, সেই সুকুমারমতি বালকের মূলপ্রকৃতির পরীক্ষা করাই ইহার উদ্দেশ্য বলিয়া অনুমান হয়। যথা—লিখিবার বস্তুস্পর্শে বিদ্যানুরাগ, ধান্যস্পর্শে কৃষিতে অনুরক্তি, অস্ত্রগ্রহণে বীরভাব, আর টাকাস্পর্শে অর্থার্জ্জনশীলতার আভাস স্থির হয়। কিন্তু, শিশুর শিক্ষাকালে আর সেই পরীক্ষার ফল স্মরণ করিয়া কেহই কার্য্য করেন না। অতএব, এখন এই পদ্ধতি, একটা দেশাচারের অন্ধ বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছে।

সমদর্শিতা, দয়া, বিনয়, অথবা ঔদ্ধত্য ও নিষ্ঠুরতা তাহাদিগকে কেহ শিখায় না। অতএব, উহাকেই প্রাক্তনসংস্কারজ অথবা সহজাত মূল-প্রকৃতি বলা যায়। পিতামাতার কর্ত্তব্য, যে, শিশুদিগের সেই মূলপ্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, সেই অক্রবাণ অবস্থা হইতেই তাহাদিগের চরিত্র গঠনের সদুপায় করেন। এই কালে তাহাদিগের যাবদীয় বৃত্তিই তরল; যত্ন দ্বারা সেই তরল বৃত্তির বেগ প্রতিকূলে লইতে কিম্বা সতেজ করা যাইতে পারে। কিন্তু এই কার্য্যে বড়ই সাবধানতার আবশ্যক।

শিশুদিগের হৃদ্বৃত্তিসমূহ, তরল হইলেও, তাহার আবেগ বড়ই প্রবল। সেই আবেগকে হঠাৎ বলপূর্ব্বক রুদ্ধের চেষ্টা করিলে, মঙ্গল না হইয়া বরং, অমঙ্গলের সম্ভাবনাই অধিক। উদ্ধত বালককে সর্ব্বদাই বাধা দিলে, তাহার তরল হৃদয় ক্ষুব্ধ ও প্রতিভা নিস্তেজ হইয়া যায়।—মনুষ্যত্বের প্রধান গুণ ওজঃ নষ্ট হয়; প্রত্যুতঃ, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমশঃ চিত্তের স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বন প্রভৃতি প্রধান বৃত্তি সকল, রুগ্ন হইতে থাকে। অবশেষে সে, ভগ্নহৃদয় হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। তাদৃশ উদ্ধতপ্রকৃতির বালককে শান্ত করিতে ইচ্ছা করিলে, তাহাকে ক্রমে বিনীতভাবাপন্ন কার্য্যে, অতি সরল উপায়ে লিপ্ত করা উচিত। অপর এতদূর সন্তর্পণে করা আবশ্যক, যে, তাহার হৃদয়, যেন জানিতেও না পায়; সে যেন ক্ষোভে ভগ্নচিত্ত না হয়। তাহাকে এরূপ খেলায় লুব্ধ করিতে হইবে, যে, হঠাৎ সে উদ্যমভঙ্গ, কি চিত্তাবেগ সম্বরণের কোনও যাতনা অনুভব করিতে না পারে।—যেন খেলার নূতন নূতন চাতুর্য্যে, সে, আপনা হইতেই মুগ্ধ হইয়া, নিত্য নবানুরাগে প্রফুল্লতা লাভ করে। অভিভাবকগণ, তাহার তরলচিত্তের সহিত মিশিয়া নানা-কৌশলে উৎসাহবৃদ্ধি করিতে পারিলে, সহজেই তাহার ঔদ্ধত্য হ্রাস

হইয়া আইসে। উৎসাহশীলা চিত্তবৃত্তি, ক্রমে তাহাকে নূতনভাবে নূতন জগতে লইয়া যায়।

তদ্ভিন্ন শিশুগণ, স্বভাবতই সঙ্গ ও অনুকরণপ্রিয়। তাহাদের অনুকরণ বৃত্তি, এত প্রবলা, যে, চিন্তা করিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। অনুকরণবৃত্তির সহিত, তাহাদের শিক্ষার পিপাসাও অল্প নহে। বস্তু-বিজ্ঞানের প্রবৃত্তিবেগে, তাহারা কথায় কথায় তত্ত্বজিজ্ঞাসু; প্রশ্নের উপর প্রশ্নের দ্বারা, আপনার ব্যাকুলতা জানাইয়া থাকে। তাহাদের চক্ষে জগতের সমস্ত বিষয়ই নূতন, সুতরাং বস্তুসকলের পরিচয়জন্য ব্যগ্র হইলে, অন্য উপায়ে তাহাদিগকে সান্ত্বনা করা কঠিন। হৃদয়ের তরলতায় ধারণাশক্তি, কিছু দুর্ব্বল বলিয়া, তাহাদিগের প্রশ্নের উচিত উত্তর দিলেও, পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিতে ক্ষান্ত হয় না। কিন্তু, যখন সেই বিষয়টী বুঝিয়া লইবে, তখন তাহা প্রস্তরফলকের ন্যায়, হৃদয়ে গাঢ় অঙ্কিত হইয়া যায়। সুতরাং পরিহাসচ্ছলেও, তাহাদের কোমল চিত্তে ভ্রান্তি জন্মান, কিম্বা তাহাদের প্রশ্নে বিরক্ত হইয়া, কাল্পনিক ভয় প্রদর্শনে ক্ষুব্ধ করা, বড়ই নিষ্ঠুরতার কার্য্য।

শিশুরা যেরূপ সঙ্গপ্রিয়, তাহাতে দুষ্ট বালককে শান্তপ্রকৃতির শিশু-দিগের সংসর্গে, এবং বাল-হৃদয়জ্ঞ চরিত্রবান্ লোকের তত্ত্বাবধানে রাখা উচিত। তাহা হইলে, সে, দুর্দ্দান্ততার অল্পই সুবিধা পায়। সে, আপনার স্বভাবজ দুষ্ট ব্যবহারের নূতন সূত্র না পাইলে, কিছুকাল দুর্দ্দান্ততা করিয়াই শ্রান্ত হয়। অথচ, শিশুরা কোনও এক কার্য্যে সর্ব্বদা নিবিষ্ট থাকিতে পারে না। মুহূর্ত্তের জন্যও অবকাশ নাই; এক কার্য্য শেষ না হইতেই, অন্য বিষয়ে আকৃষ্ট হয়। তখন, সেই দুষ্টবালক, সুশীল সঙ্গীদিগের প্রবর্ত্তিত খেলা বা কার্য্যে যোগ না দিয়া থাকিতে পারে না। ইহার মধ্যে নূতন কিছু দেখিলেই তাহার তত্ত্ব জানিতে ব্যগ্র হইয়া উঠে। তখন

তাহার রক্ষক, তাহার হৃদয়ের সহিত মিশিয়া যদি, অতি সরল ভাবে ধীরে ধীরে জ্ঞাতব্য বিষয় বুঝাইয়া দেন, এবং একই কথা পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিলেও ত্যক্ত না হইয়া, সাবধানে বারম্বার তাহার উত্তর প্রদান করেন, তবেই সে চরিতার্থ হয়। এইরূপে একদিকে বুদ্ধিমান্ রক্ষক, তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন নূতন বিষয়ে উৎসাহী করিলে, অন্য দিকে সুসঙ্গীদিগের কার্য্য ও খেলায় নিবিষ্ট হইলে, তাহার প্রকৃতি, অবশ্যই পরিবর্ত্তিত হইবে। ক্রমে প্রস্তাবিত সৎসংসর্গের দৃষ্টান্তে সুশীলতাই তাহার অভ্যস্ত হইবে; অবশেষে সে দুষ্ট ব্যবহারের অবকাশ না পাইয়া ধীরে ধীরে শান্ত প্রকৃতিও লাভ করিবে। বরং পূর্ব্বে দুষ্টতা করিতে যে বুদ্ধিকৌশল চালাইত, সেই বুদ্ধিকৌশল সুশিক্ষায় প্রয়োগ করিয়া, কালে সে মহান্ আত্মোন্নতি লাভ করিতে পারে।

শিশুরা, দৌড়াদৌড়ি করিলেই, দুষ্ট ব্যবহার হয় না। উহা তাহাদিগের বাল্য ব্যায়াম, সুতরাং স্বাস্থ্যের অনুকূল। দুষ্টাভিসন্ধিতে অবাধ্যতাই দোষজনক। অতএব, শিশুদিগকে আদর করিয়া আহার যোগাইলে, কিম্বা রোগের সময় চিকিৎসা করাইলেই, অভিভাবকদিগের কর্ত্তব্য শেষ হয় না। তাহাদিগের মূল প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, শরীরের ন্যায়, মনের সৎবৃত্তিগুলিকে সুপথ্য দ্বারা সতেজ করা কর্ত্তব্য। আর কুপ্রবৃত্তি নিস্তেজ হইয়া, ধর্ম্মপ্রবৃত্তিসকলের স্ফূর্ত্তিলাভ সম্বন্ধেও, তাঁহারাই সম্পূর্ণ দায়ী। দুঃখের বিষয়, যে, অনেক পিতামাতাই তাঁহাদিগের দায়ীত্ব বুঝিয়া উঠেন না। তাঁহারা বেতন দিয়া শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়াই, সন্তানের সুশিক্ষার দায়ে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। বরং অনেক গৃহে শিশুর শিক্ষায় ইহা হইতেও কুৎসিত উপায় প্রয়োগ হইয়া থাকে। শিশুরা বিষয় বিজ্ঞানে ব্যগ্র হইয়া প্রশ্ন করিলে, অনেকেই "বালকের প্রলাপ" মনে করিয়া যা, তা, একটা উত্তরে নিরস্ত করেন। সময় সময়, বারম্বার প্রশ্নে

বিরক্ত হইয়া ধমক দিয়া, কিম্বা "ছেলে ধরা" "জুজু" ইত্যাদির ভয় দেখাইয়া সুকুমারমতি শিশুকে ভ্রান্তিজালে নিক্ষেপ করেন। শিশু রোদন করিলে তাহাকে কোনও দ্রব্য দিবার মিথ্যাভাণে প্রলোভিত করেন; ফলতঃশিশু যখন সেই দ্রব্য পাইবার নিমিত্ত আগ্রহ করে, তখন তাহার সঙ্গে নানাছল ব্যবহার করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। কিন্তু তাঁহারা বুঝিতে পারেন না, যে, এই উপায়ে নির্দ্দোষ শিশুরা মিথ্যাকথা, ছল, প্রভৃতি সহজেই আয়ত্ব করিয়া ফেলে। ঠাকুরদাদা, ও দিদিমা জাতীয়-গণ, রহস্যচ্ছলে, তরলপ্রকৃতি শিশুর অন্তঃকরণে, শত শত নীচ ব্যবহার ও কুৎসিত নীতি প্রবেশ করাইয়া থাকেন। সেই ক্ষণিক আমোদে যে তাহাদের সংস্কার কলুষিত হয়, তাহা কেহই চিন্তা করেন না। পূর্ব্ব-কালের সমাজে এরূপ দুর্নীতির এককালে অভাব না থাকিলেও, অনেক গুলি সুনিয়ম প্রচলিত থাকায়, তত অপকার হইত না। পূর্ব্বকালে পরিবারস্থ সকলেই, বালক বালিকাদিগকে সর্ব্বদাই সদাচার শিক্ষা দিতেন। গুরুজনের প্রতি কর্ত্তব্য, বিনয়, নম্রতা ও স্বধর্ম্মে আনুরক্তি জন্য দণ্ডে দণ্ডে শিক্ষা দিয়া, চরিত্র গঠনের সহায়তা করিতেন। পরোপকার, আতিথ্য, দেবভক্তি, ও স্ব স্ব কুলের পরিচয় শিক্ষার জন্য, শিশুদিগকে পুস্তক পাঠ করিতে হইত না। পরিবারস্থ লোকেই তাহা শিখাইতেন। সরল, সরল, উপদেশ পূর্ণ কবিতা শিক্ষা, একটা নিত্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত ছিল। কিন্তু, এখন আর সেরূপ সুবিধা নাই। পিতা প্রভৃতি অভিভাবকগণ, বিষয় কর্ম্মে ব্যাপৃত। তাঁহারা, দিনের মধ্যে শিশুকে দুটী আদরের কথা বলিয়া, একটী চুম্বন দিতে পারিলেই, আপ-নাকে ভাগ্যবান্ বিবেচনা করেন। মাতা প্রভৃতি গৃহলক্ষ্মীরা, যদিচ আর রন্ধনাদির দুর্ব্বহ ক্লেশ সহ্য করেন না, এবং পূর্ব্ব গৃহিণীদিগের ন্যায় অতিথি, অভ্যাগতদিগের সেবায়, কিম্বা পরিবারস্থ দাসদাসী পর্য্যন্ত

সকলের ভোজন অন্তে, দিবাবসানে আহার করিয়া স্বাস্থ্যভঙ্গ ও বৃথা সময় নষ্ট করেন না। কিন্তু, তাহা বলিয়াও ত তাঁহাদের অবসর নাই। বিদ্যা শিক্ষা, শিল্পকার্য্যে, গল্পে, দেহের পারিপাট্যে, চারি প্রহর দিনেও তাঁহাদের কুলায় না। সংসারের প্রস্তাবিত কার্য্য করিয়া, যদি কিছু অবসর থাকে, তবে, মনোরম উপন্যাস পাঠ ও কথঞ্চিৎ নিদ্রাতেই তাহা কাটিয়া যায়। সুতরাং, বালক বালিকাকে শিখাইবার অবকাশ হইয়া উঠে না। যদিচ, এইরূপ কার্য্য পরম্পরায়, বঙ্গনারী মাত্রেই দিনযাপন করেন না। কিন্তু, নূতন সভ্যতার যেরূপ প্রশার বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে, অল্পদিন মধ্যে যে, বঙ্গের গৃহে গৃহে তাহা দেখিতে হইবে না, ইহা কেহই বলিতে পারেন না।

শিশুদিগের প্রকৃতি এবং শক্তি পরীক্ষা করিয়া, অভিভাবকেরা যদি ধীর ভাবে চেষ্টা করেন, তবে ঘরে ঘরে সুপুত্র ও সুশীলা কন্যার গঠন হইতে পারে। শিশুদিগের অনুকরণ শক্তি, বিষয় বিজ্ঞান চেষ্টা এবং তরল মেধার অসীম শক্তি। যে ভাষা, উন্নত বয়স্ক, শিক্ষিত লোক, পাঁচ বৎসরের অধ্যবসায়ে, পুনঃপুনঃ আবৃত্তিতেও শিখিতে পারে না; শিশুরা, পাঁচ বৎসর বয়সের মধ্যে, শৃঙ্খলাবদ্ধ আবৃত্তি ব্যতিরেকে, খেলা করিতে করিতে, অসংখ্য বস্তু পরিচয়ের সহিত সেই ভাষা শিখিয়া ফেলে। তাহার কারণ এই যে, যে কার্য্যে প্রবল আসক্তি জন্মে, চিত্ত বৃত্তি সকল, সহজেই তাহার অভিমুখী হইয়া থাকে। তজ্জন্য, হৃদয়ে বল প্রয়োগের আবশ্যক হয় না। শিশুরা নূতন জগতে আসিয়া, সকলই নূতন দেখিতে পায়; তাহার রহস্য জানিবার উদ্যমে, অন্যের ইচ্ছার বশবর্ত্তীতায় হৃদয়কে এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে লইতে হয় না। আর, বয়স্থ লোককে, নূতন বিষয় শিক্ষার সময়, হৃদয়ের ঘনীভূত বৃত্তিকে অন্য বিষয়ে লইতে—অন্য আকারে পরিণত করিতে অন্য বিষয় মুগ্ধ-বাসনাকে

বলপ্রকাশে প্রয়োজনের অধীন আনিতে হয়,অতএব তাহার ফলও সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়। ইহার সহস্র সহস্র উদাহরণ, সকলের সম্মুখেই আছে। বর্ত্তমানকালের, অর্থকরী বিদ্যার্থী বালকেরা, অভিভাবকদিগকে, সর্ব্বদাই নূতন নূতন দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে। যাহার যে বিদ্যায় প্রবৃত্তি নাই, সাধারণ শিক্ষা প্রণালীর নিয়মে, তাহাকে সেই বিদ্যাই গিলিতে হয়; অবশেষে হৃদয়ের প্রতি ঘোর অত্যাচারে, অনেকেই ওজঃ, স্ফূর্ত্তি এবং উৎসাহ হারাইয়া, চিরজীবনের জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। অর্থলোভী অভিভাবকেরা, তাহা বুঝিয়াও বুঝেন না। বালকের মূলপ্রকৃতি, কোন্ কার্য্যের অনুগামিনী, তাহার তত্ত্ব লইতেও চেষ্টা করেন না। অল্পদিন পরে তাঁহাদের সাধের পুত্ররত্ন, (ভবিষ্য জীবনে অনাবশ্যকীয়) অঙ্ক, দর্শন, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, ইত্যাদি বিদ্যার বোঝা, পেটে লইয়া নানারোগে রুগ্ন ও ভগ্ন হৃদয়ে যখন বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাগমন করে, তখন, বুঝা যায় যে, সে, যে সমস্ত বিদ্যার বোঝা আনিয়াছে, তাহার দুই একটী ব্যতীত, সমস্তই পণ্ডশ্রম। অনেকগুলিই, ভুলিয়া যাওয়া ভিন্ন, সংসারে সাধের অর্থ উপার্জ্জন পথে, কিছুই সহায়তা করে না।

এই সকল বালকের অভিভাবকেরা, অনেকে বলিয়া থাকেন যে, নানা বিষয়ে অধিকার হইলে মনুষ্যত্ব জন্মে।—সংসারে অর্থার্জ্জনমাত্র প্রয়োজনীয় হইলেও, বহুবিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মিলে, গন্তব্য পথ প্রশস্ত হয়, সকলের নিকট সম্মান লাভ করা যায়। কিন্তু তাঁহাদের কথা স্বীকার করিলেও, সকল ক্ষেত্রে সুফল দেখা যায় না। প্রাচীনকালে আর্য্যেরা, অনেকেই অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারা, প্রথমে বালকদিগকে ভাষা মাত্র শিক্ষা দিতেন। বালকেরা ভাষায় পারদর্শী হইলে, তাহার মূল প্রকৃতি, সংসারের কোন্ বিষয়ে অভিমুখী, তাহা বুঝিয়া স্মৃতি, দর্শন, জ্যোতিষ, পদার্থ বিদ্যা প্রভৃতির মধ্যে, যেটী বালকের মনোনীত হয়,

তাহাই তাহাকে শিক্ষা দিতেন। * বালকও, মহোৎসাহে, তাহা আয়ত্ব করিয়া, সেই লক্ষ্য বিষয়ের চরম উৎকর্ষের জন্য, জীবন অতিবাহিত করিত। বালক উৎসাহী থাকিলে,—তাহার সেরূপ প্রতিভার বল পাইলে, সর্ব্বপ্রকার বিদ্যায় সুপণ্ডিত হইত। বর্ত্তমান শিক্ষা, সে প্রণালীর হইলে কোনও আপত্তি ছিল না; আর এত দুর্ব্বিপাকও ঘটিত না। বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর দোষে, আত্ম রুচিগত বিদ্যাকে সঙ্কীর্ণ রাখিয়া, পাশের অনুরোধে অরুচিকর বিদ্যা উদরস্থ করিতে হয়। অথচ কোন বিষয়েই পারদর্শীতা জন্মে না, কিম্বা সংসারের পথে সেই বিদ্যা খাটাইয়া কেহ সুখী হইতেও পারে না।

শরৎসুন্দরীর প্রকৃতি, আশৈশবই মহত্বের পরিচায়ক ছিল। তিনি বাল্যকালে যেমন হৃষ্টপুষ্ট ও সুস্থ ছিলেন, প্রকৃতিও সেইরূপ শুদ্ধ শান্ত ছিল। তাঁহার দেহে সেই বয়সেই, স্ত্রী-জন-সুলভ লজ্জার সঞ্চার হইয়াছিল। যে বয়সে অন্য বালিকারা উলঙ্গ অবস্থায় থাকে, শরৎসুন্দরী, সেই বয়সে, আপন হাতে কাপড় পরিতে শিখিয়াছিলেন; বহির্ব্বাটীতে আসিতে লজ্জা বোধ করিতেন। তাঁহার শিশু চরিত্রে, এরূপ গুণ সমাবেশের প্রধান কারণ, তাঁহার পূজনীয়া জননী। দ্রবময়ী, অতি সুশীলা এবং গুণবতী মহিলা ছিলেন। প্রাচীন বয়স পর্য্যন্তও, তাঁহাকে কেহ, অবগুণ্ঠন মোচন করিতে দেখে নাই। তিনি আজীবন, সংসারের কোনও কর্ত্তৃত্বে যাইতেন না। তিনি আজীবন অন্যের অধীনা হইয়া, অন্তঃপুরের নিভৃতকক্ষে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। শরৎসুন্দরী,

* ইহা ভিন্ন, আর্য্যশিক্ষাপ্রণালীর মূলে আর একটী অদ্ভুত উপায় ছিল। জাতিভেদে কার্য্যভেদ ছিল বলিয়া, প্রত্যেক জাতীয় বালক, জ্ঞানোদয় হইতেই, নিজ পরিবারের জাতীয় ব্যবসায় বুঝিতে পারিত। জাতীয় কর্ত্তব্যতা, তাহার মর্ম্মে ২ প্রবিষ্ট হইয়া, তাহাকে সেই কার্য্যে অভ্যস্ত করিত। সুতরাং সেই বালক বুদ্ধিমান হইলে, জাতীয় বিদ্যার উন্নতি করিতেও পারিত।

সেই গর্ভে জন্মিয়া, সেই দেবীমূর্ত্তি সম্মুখে দেখিয়া, সেই সুশীলা জননীর সৎকার্য্যের সহচরী হইয়াই, বাল্যকালে এইরূপ চরিত্র লাভ করিয়াছিলেন। তিনি খেলায় তত অনুরক্তা ছিলেন না; অন্য সঙ্গিনীর দৃষ্টান্তে, কখন কখন, পুতুলের সংসারে কর্ত্তৃত্ব করিতেন, ধূলি ইত্যাদি লইয়া রন্ধন পরিবেশনের অনুকরণ করিতেন। কিন্তু, খেলাতেও তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠার অনুষ্ঠান ছিল। খেলা ছলে তিনি, দেব পূজা, জপ, ও ব্রতানুষ্ঠান করিতেন। ইহার পর, বাড়ীতে কোনও ব্রত নিয়ম অথবা দেবার্চ্চনাদির উৎসব হইলে, তাঁহার, খেলায় মন থাকিত না। তিনি, মাতার সঙ্গে প্রবীণার ন্যায়, ব্রত পূজাদির দ্রব্যজাত আয়োজনে প্রবৃত্তা হইতেন। অন্যের দৃষ্টান্তে শুদ্ধাচারে ও পবিত্র দেহে থাকিয়া, অতি দক্ষতার সহিত, ঐ সকল কার্য্য করিতেন। শিবরাত্রি এবং জন্মাষ্টমী প্রভৃতির উপবাস জন্য, বিনীত ভাবে পিতা মাতার নিকট আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু, পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকাকে, কেহই উপবাসের বিধি দিতেন না; তখন, অন্যে তাঁহার শান্তির লাবণ্যময়ী মুখের মালিন্য দেখিতে পাইত। কিন্তু, হৃদয়ে বিশেষ কষ্ট হইলেও, কদাচ পিতা মাতার নিকট ধৃষ্টতা, কি অবাধ্যতা প্রকাশ করিতেন না। হৃদয়ের ইচ্ছা হৃদয়েই দমন করিতেন।

এতদ্দেশে ভাদ্র, পৌষ, ও চৈত্র মাসে, পূর্ণিমা অথবা বৃহস্পতিবারে, হিন্দু মহিলাগণ, স্বয়ং লক্ষ্মীর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। সেই সময়, পরিবারস্থ স্ত্রীমণ্ডলী, একত্রে বসিয়া লক্ষ্মী চরিত্র সংক্রান্ত কতকগুলি উপাখ্যান আলোচনা করিয়া থাকেন। * সেই উপাখ্যানগুলি "লক্ষ্মীর

* হিন্দু মহিলাগণের আবাল্য চরিত্র শোধন ও গৃহধর্ম্ম করণীয় উপদেশ লাভের, ইহা একটী চমৎকার সদুপায়। সংসারের আবলো যদি কখন সেই উপদেশ ভুলিয়া যান, সেই জন্য, চারিমাস পর পর, বৎসরের মধ্যে উহা তিনবার আলোচনার পদ্ধতি আছে।

কথা” নামে প্রসিদ্ধ। শরৎসুন্দরী, পঞ্চম বৎসর বয়সের সময়, তাহার অনেকগুলি কথা শিখিয়াছিলেন। তীব্র মেধা বলে এইরূপ। নৈতিক উপখ্যান, এবং গার্হস্থ্য নীতির স্ত্রী পরম্পরা প্রচলিত বিস্তর কবিতা, মুখস্থ করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন বালিকার, ভবিষ্যত চরিত্র গঠনের, আর একটী সুযোগ ঘটিয়া ছিল। তাঁহার পিতার বিস্তৃত অতিথিশালা, তাঁহার সুশিক্ষার সাহায্য করিয়াছিল। * তিনি, সর্ব্বদাই অতিথি-দিগকে স্বচক্ষে ভোজ্য বিতরণ দেখিতেন। ইহাদিগের মধ্যে, অন্ধ, বিকলাঙ্গ, অসমর্থ, দীন দুঃখীর অভাব ছিলনা। তাহাদিগের দুর্দ্দশায় বালিকার অন্তঃকরণ, বড়ই ব্যথিত হইত। বহুদেশ পর্য্যটনে, নানা জাতির সংঘর্ষে, যে যে বিষয়ে অভিজ্ঞতা হয়, একটী প্রকাণ্ড অতিথি শালায় সেরূপ না হইলেও, লোক চরিত্র বুঝিবার অনেক সুবিধা আছে। তাহাতে নানা দেশীয়, নানা প্রকৃতির লোক দেখা যায়। শরৎসুন্দরী, সেই অতিথিশালা প্রবাসী, নানা শ্রেণীর লোকের নিকট, নানা কথা শুনিতেন; মনুষ্য জীবনের চরম বিভীষিকা দেখিতেন; দরিদ্রের ও ব্যাধিগ্রস্তের দুঃখ, এবং দুঃখ সহিষ্ণুতা দেখিয়া, বালিকা, এক এক সময় আত্মহারা হইতেন। আপনার সাধ্যমত, তাহাদের দুঃখ মোচনের চেষ্টা করিতেন। ফলতঃ সংসারীর এই সকল দুর্গতি দেখিয়া, তাঁহার

এই গল্পের সমষ্টি, প্রায় ২৫।৩০টী হইবেক। তন্মধ্যে অন্ততঃ ১৭টী উপাখ্যান আলোচনা অবশ্য কর্ত্তব্য। কোনও গুরুতর প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলেও, তাঁহারা নিতান্ত পক্ষে তিনটী কথা না শুনিয়া জল গ্রহণ করা, নিতান্ত অমঙ্গল কর বলিয়া বিশ্বাস করেন।

* ভৈরবনাথ, একজন প্রসিদ্ধ আতিথেয় ছিলেন। পুঠিয়া রাজবাটীতেও অতিথি সেবা আছে। ভৈরবনাথ, স্বয়ং বিশেষ সমাদর করিতেন বলিয়া, তাঁহার বাটীতেই বহু অতিথির সমাগম হইত। আতিথ্যে তাঁহার কালাকাল, পাত্রাপাত্র বিবেচনা ছিল না। তিনি, সাধারণ ভিক্ষুক হইতে, যাত্রা গানের দল, সাপুড়িয়া, বাজীকর এবং রাজবাটীতে কর্ম্ম প্রার্থীদিগকে পর্য্যন্ত আহার দিতেন। সকল সম্প্রদায়ের লোকেরই, নির্ব্বিশেষে আশ্রয় এবং আহার যোগাইতেন। ঐ সকল ব্যক্তি, দুই চারি দিন দূরাস্তাং, দীর্ঘকাল থাকিলেও ভৈরবনাথ কুণ্ঠিত হইতেন না।

হৃদয়ে আত্মদুঃখে বিস্মৃতি, ত্যাগ, ক্ষমা ও পরদুঃখ কাতরতা প্রভৃতি গুণের উন্নতি লাভ হইয়াছিল। তিনি, এক একটী দুঃখের চিত্র দেখিতেন, আর তাঁহার মূল প্রকৃতি, তাঁহাকে সংসারের দূর হইতে দূরতর স্থানে লইবার জন্য উদ্বোধন করিত। পাঁচ বৎসর বয়সের বালিকার, এরূপ পরদুঃখ কাতরতায় সহানুভূতি, পরোপকার চেষ্টা, অন্যত্র দুর্ল্লভ না হইলেও, অসাধারণ বলিতে হইবে।

শরৎসুন্দরী, ভাল আহারীয়, কি উত্তম পরিচ্ছদাদির নিমিত্ত, এক দিনের জন্যও আগ্রহ করিতেন না। আপনার ভাগের খাদ্য, অন্যকে বিতরণ করিয়া দিয়া অবশিষ্ট নিজে খাইতেন। কোনও তামসিক উৎসবে, স্বেচ্ছায় যোগ দিতেন না। তাঁহার মুর্ত্তি অতি শান্ত, ধীর, এবং অমায়িকতার লাবণ্যে জড়িত ছিল। এবং মুখের দিকে লক্ষ্য করিলে, যেন, গুরুতর চিন্তাশীলতার স্বর্গীয়ভাবে অভিভূত বলিয়া বোধ হইত। তিনি, ধনাঢ্য পিতা মাতার একমাত্র কন্যা বলিয়া, পরম আদরের পাত্রী ছিলেন। তাঁহার পিতা, তাঁহাকে সর্ব্বদা নানা ভোগসুখে রাখিতে চেষ্টা করিতেন;—নানা প্রকার উত্তম উত্তম খাদ্য ও পরিচ্ছদাদি দিতেন। কিন্তু, বালিকার হৃদয়ে ভোগেচ্ছার লেশমাত্রও ছিল না। তজ্জন্য পিতা মাতার সাধপূর্ণ হইত না। এখন তাঁহার সেই বাল্যব্যবহার স্মরণ করিলে বুঝা যায় যে, তিনি, শৈশবেই যেন, আপনার প্রাক্তনলিপি পাঠ করিয়াছিলেন।* যেন বুঝিয়া ছিলেন, যে, তাঁহার ভবিষ্য-জীবন ঘোরতম দুঃখময়। তাহাতেই তাঁহার জীবনের কর্ত্তব্যগুলি, যেন ধীরে ধীরে

* ভৈরবনাথের মাতা, শরৎ সুন্দরীর অক্রবাণাবস্থায় একজন গণকের দ্বারা ভাগ্য-গণনায় জানিয়াছিলেন যে, তিনি অল্প বয়সে বিধবা হইবেন। সেই হইতে ভৈরব নাথের মাতা, পৌত্রীকে বাল্য উত্তীর্ণ ভিন্ন বিবাহ দিবেন না বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু, বিধিলিপি অসাধ্য। উপযুক্ত বর পাইয়া তাঁহার বয়স ছয় বৎসর পূর্ণ না হইতেই বিবাহ হয়।

অভ্যাস করিয়াছিলেন। সেই বাল্যজীবনেই পিতার অতিথিশালা দেখিয়া সংসারকে, পরমপিতার একটী অতিথিশালা বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন।* তিনি যেন বুঝিয়াছিলেন, এই সংসার অতিথিশালায় তিনিও একজন অতিথি। এখানে কোনও অতিথি, দুই চারি দিন থাকিতে পায়, আবার কেহ বা, এক মুহূর্ত্তও বিশ্রাম করিতে পারে না। সামান্য অতিথিশালার প্রবাসীগণ, অনেকে আপনার পরিপাকশক্তি না বুঝিয়া, গুরুতর আহারের সদ্যফলভোগ করে। শয়ন উপবেশনের স্থান লইয়া পরস্পর বিবাদ করে। সংসাররূপ অতিথিশালাতেও সেইরূপ দৃষ্টান্ত। কেহ পরিণাম না বুঝিয়া পাপরূপ বিষভোজনে, দুঃখের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করে; আত্মগ্লানি ও অনুতাপের অগ্নিতে জীবন্তে দগ্ধ হয়। ভূমি লইয়া, সামান্য সামান্য বস্তু লইয়া, পরস্পরে কলহ করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। পুত্র কলত্রের মমত্বে মুগ্ধ হইয়া, তাহাদের সুখের জন্য, আপনার পাশব বৃত্তি চরিতার্থ জন্য, পরের সর্ব্বনাশ করিতেছে। কিন্তু, একবার চিন্তা করে না, যে, এই শস্য পূর্ণা বসুন্ধরা চিরকাল যেমন আছে, পরেও তাহাই থাকিবে; ইহার একটী পরমাণুতেও, কাহার স্বত্ব নাই। মনুষ্য

* তিনি বিধবা হইবার পর, সময়ে সময়ে যে সকল কথা বলিতেন, তাহাতেই এই সমস্ত বিষয় বুঝা যাইত। একদিন, কোন এক বিষয় উপলক্ষে, একজন সঙ্গিনীকে বলিয়াছিলেন, যে,—"আমি শিশুকালে ভাল খাব, ভাল পরিব বলিয়া, বাবাকে একদিনও বিরক্ত করি নাই; তখন হইতেই সংসারকে ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখিয়াছি। যোগী সন্ন্যাসীদিগের কিম্বা অন্যের নিকট, যখন নানা তীর্থের কথা, তীর্থ মহিমার কথা শুনিতাম, তখনই আমার সেই সেই স্থান দেখিতে ইচ্ছা হইত। বাবার অতিথিশালা দেখিয়া, সেখানে নানা অবস্থার লোক দেখিয়া, সময় সময় সংসারের প্রতি আমার বড়ই অশ্রদ্ধা হইত। কিন্তু কেন হইত, তখন তত বুঝিতাম না। এখন বুঝিতেছি, আমার দুঃখময় অদৃষ্টই আমাকে ঐরূপ প্রবৃত্তি দিত। সে সময়ে অভ্যাস না হইলে, এত দুঃখ সহিতে পারিতাম না। আর সেই অতিথিশালায় দুঃখীর অবস্থা দেখিয়া, আমার মনে হইত, আমি বড় হইয়া নিজের শক্তিমত আতিথ্য করিব। কিন্তু, এখন দেখিতেছি, দুঃখীর দুঃখ মোচন, আমার ক্ষুদ্র শক্তির অসাধ্য।

এই অতিথিশালা পরিত্যাগের সময় ইহার কিছুই সঙ্গে লইতে পারিবে না। তবে, নিজের অর্জ্জিত কর্ম্ম লইয়া সকলকেই যাইতে হইবে। সামান্য অতিথিশালা হইতে এই সংসার অতিথিশালার কিছুই প্রভেদ নাই। শরৎসুন্দরী, যেন এই সত্যের ছায়া শৈশবেই পাইয়াছিলেন। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, সংসারের নানা ঘাত প্রতিঘাত সহিতে সহিতে, এই সত্য, তাঁহার হৃদয়ে নির্ম্মল আলোক প্রদান করিয়াছিল। তাঁহার পরবর্ত্তী কার্য্যের আলোচনা করিলেই তাহা বুঝা যায়।

বালিকার হৃদয়ে কুটিলতার লেশও ছিল না। ইহজীবনে কেহ তাঁহাকে ক্রোধ কি অভিমান করিতে দেখে নাই। অন্যে যাহাতে মনে ব্যথা পাইতে পারে, সত্য হইলেও তিনি তাহা বলিতেন না। পিতা মাতার নিকটে কোনও বিষয় আবদার করিতেন না। পরিবারস্থ দাসদাসীদিগের নিকটেও তিনি, অতি নম্রতার পরিচয় দিতেন। কাহারও কোনও কষ্ট দেখিলে, যথাসাধ্য তাহা নিবারণের চেষ্টা করিতেন, শেষে অপারগ হইলে নীরবে রোদন করিতেন। এই পাঁচ বৎসর বয়সের মধ্যে সকলে ইহার বিস্তর দৃষ্টান্ত দেখিয়াছে; বাহুল্য বোধে দুইটী মাত্র এস্থানে উল্লেখ করা যাইতেছে। *

কোনও দিন, ভৈরবনাথ, এক গুরুতর অপরাধে একজন পাচক ব্রাহ্মণের পাঁচ টাকা দণ্ড করেন। ব্রাহ্মণ, তজ্জন্য দুঃখিত হইয়া রোদন করিতেছে। বালিকা শরৎসুন্দরী, তাহা দেখিয়া ব্যাকুলভাবে ব্রাহ্মণকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। অন্যে প্রশ্ন করিলে, ব্রাহ্মণ, সম্ভবতঃ কোন উত্তর করিত না। কিন্তু এই দয়াময়ী বালিকার সুমিষ্ট কথায়

* লেখক, এই জীবনচরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া, মহারাণী শরৎসুন্দরীর সম্পর্কীয় অনেকের সহিত এই বিষয়ে আলাপ করিয়াছে। সেই আলাপের সময়, ইঁহার বাল্যকালের কার্য্যকলাপের এত পরিমাণ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনা শুনিয়াছে যে, তাহার সকলগুলি প্রকাশ করিলে প্রকাণ্ড একখানি পুস্তক হইতে পারে।

এবং শান্তিময় মুখ দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ; কেহই তাঁহার নিকট কোনও কথা বলিতে পণ্ডশ্রম মনে করিত না। বালিকাকে সকলে দয়াবতী প্রবীণা বিবেচনায়, তাঁহাকে আপনার সুখ দুঃখের কথা জানাইত! ব্রাহ্মণও আপনার বৃত্তান্ত জানাইয়া "সে দরিদ্র, বাড়ীতে তাহার বিস্তর-পোষ্য, দণ্ডের টাকা কোথায় পাইবে" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। বালিকা তাহার দুঃখে দ্রবীভূতা হইলেন, ব্রাহ্মণের অপরাধের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। এখন কিরূপে তাহার কষ্ট নিবারণ করিবেন, তাহা ভাবিয়াই ব্যাকুল হইলেন। পিতার নিকট এই বিষয় বলিলে, তিনি সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণের অপরাধের গুরুত্বে, অনুরোধ না শুনিতেও পারেন। কিন্তু, বালিকার নিজের এমন কি আছে, যে, তাহা দিয়া ব্রাহ্মণের উপকার করিবেন। পিতা, সময় সময় তাঁহাকে দুই একটী টাকা দিতেন, তাহা সমস্তই দানে নিঃশেষিত হইয়াছে: বালিকা, অবশেষে চিন্তা করিয়া, তাঁহার পিতার একটী পুরাতন কর্ম্মচারীর নিকটে গিয়া, পাঁচটী টাকা ধার চাহিলেন। কর্ম্মচারী, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বালিকা, কোনই উত্তর না দিয়া অতি মলিনভাবে অধোমুখে রহিলেন। কর্ম্মচারী আর অধিকক্ষণ, তাহা দেখিতে পারিল না। বালিকার স্বর্গীয় ভাবে সে, এককালে আত্মহারা হইয়া তাঁহার বশীবর্ত্তী হইল। আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তখনই পাঁচটী টাকা আনিয়া দিল। বালিকা, সেই টাকা আনিয়া গোপনে ব্রাহ্মণের হাতে দিলেন; আর তাহাকে এই কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াই, দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ, কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের অবকাশও পাইল না। ক্রমে দুই এক দিনের মধ্যেই এ কথা ভৈরবনাথের কর্ণগোচর হইল। তিনি কন্যার এই সদয় ব্যবহারে বরং সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন—"মা, একথা আমাকে বলিলেই হইত।

তোমার যখন যাহা আবশ্যক হয়, নির্ভয়ে আমাকে বলিও”। বালিকা লজ্জায় অধোমুখী হইয়া রহিলেন। ভৈরবনাথ, কর্ম্মচারীর প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করিলেন।

আর একদিন ভৈরবনাথ, কোনও গুরুতর অপরাধে জনৈক প্রাচীন কর্ম্মচারীকে * কর্ম্মচ্যুত করেন। সেই কর্ম্মচারী, শরৎসুন্দরীকে কিছুই বলিয়া ছিল না। কিন্তু বালিকা, অন্যের নিকট এই বৃত্তান্ত শুনিয়া, আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলেন। তাঁহার বিশ্বাস এই, যে, এই প্রাচীন ব্রাহ্মণ জীবিকা অর্জ্জনে অক্ষম ; সুতরাং অন্নাভাবে মরিবে। কিন্তু, কি উপায়ে তাহার উপকার করিবেন, তাহা ভাবিয়া আকুল হইলেন। যদিচ, ভৈরবনাথ, ইতিপূর্ব্বে বালিকাকে যখন যাহা আবশ্যক হয়, তাহা বলিবার অনুমতি করিয়াছিলেন ; কিন্তু, শরৎসুন্দরী, তাদৃশ আদেশ থাকিলেও, পিতার নিকটে কোনও দিন কিছু বলিতে সাহসী হইয়াছিলেন না। অদ্য ভাবিয়া দেখিলেন, পিতা ব্যতীত তাঁহার মনের যাতনা নিবারণের অন্য উপায় নাই। তাঁহার ধৃষ্টতায় পিতা রুষ্ট হইতে পারেন, একবার এই শঙ্কা মনে উদয় হইল। পিতার নিকট যাইতে লজ্জা বোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু, অন্য পথ নাই ; কাজেই লজ্জায়, ভয়ে, অতি সঙ্কুচিতভাবে পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বৃদ্ধ কর্ম্মচারীর অপরাধ মার্জ্জনার জন্য, কাতরভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সে সময়ে কর্ম্মচারীর দুঃখ ভাবিয়া, তিনি এরূপ অভিভূত হইয়াছিলেন, যে, পিতাকে সে কথা বলিতে বলিতে, কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া দুই চক্ষে অজস্র অশ্রুপাত হইতে লাগিল। সমুদায় কথা শেষ করিতে পারিলেন না। ভৈরবনাথ, বালিকার মুখে যে অত্যল্প মাত্র শুনিয়াছিলেন, বালিকার করুণাময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া অবশিষ্ট সমস্তই বুঝিয়া লইলেন ;

* এই কর্ম্মচারীর নাম গোবিন্দচন্দ্র তালুকদার। জাতিতে ব্রাহ্মণ।

এবং তদ্দণ্ডেই কর্ম্মচারীর অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া পুনরায় তাহাকে নিযুক্ত করিলেন।

বালিকার এই পাঁচ বৎসর বয়সে কর্ম্মের প্রণালী, শৃঙ্খলা এবং যাহাতে যাহা আবশ্যক, তাহার সুব্যবস্থায় আশ্চর্য্য অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। তিনি, অল্প বয়সে জননী প্রভৃতি পুরমহিলাগণের নানা কার্য্যে সাহায্য করিতেন। দেবার্চ্চনা ব্রত নিয়মাদির দ্রব্যাদির, কি গৃহের সামগ্রী সকল, উৎকৃষ্ট প্রণালীবদ্ধে পরিপাটীরূপে সাজাইতে পারিতেন। ঐ সকল কার্য্যে বুদ্ধির প্রখরতা, নিপুণতা, এবং উচ্চাশয়-তার পরিচয় দিতেন। তিনি, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যেও, নূতন প্রণালী, নূতন নূতন ব্যবস্থার উদ্ভাবন করিয়া, এরূপ তৎপরতা দেখাইতেন, যে, অন্যে তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিত। একদিন ভৈরবনাথের পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে, নানা সামগ্রীর আয়োজন হইতেছে। শ্রাদ্ধের জলদান, বস্ত্রদান, অন্নদান এবং তাম্বুলদানের সজ্জা, শরৎসুন্দরী স্বহস্তে করিতেছেন। তিনি সজ্জা করিতে করিতে দেখিলেন, যে, জলদানের জল, পীতলের ঝারিতে—তাম্বুলদানের কাঁসার পানবাটায়, পান, গুপারি, মসলা, যেমন সজ্জা প্রয়োজন তাহাই হইল; কিন্তু, অন্নদানের তণ্ডুল, ঘৃত আদি, একখানি পীতলের থালায় কেন সজ্জা করিতে হইল, ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলেন না। এই সময় ভৈরবনাথ, শ্রাদ্ধ করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। বালিকা, অন্নদানের উদ্দেশ্য বুঝিবার জন্য, পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে,—"বাবা পীতলের থালায় চাল ঘৃত সাজাইয়া দিবার কারণ কি?" ভৈরবনাথ হাসিয়া বলিলেন "মা, যেমন জলপানের জন্য ঝারি, আর পাণ খাইবার জন্য বাটা দেখিতেছ, তেমনই ভাত খাইবার জন্য থালাও আছে। মনুষ্যে যে কার্য্যের জন্য, যে যে দ্রব্য ব্যবহার করে, দান করিতেও, সেই সেই প্রয়োজন বুঝিয়া

আয়োজন করিতে হয়।" তদুত্তরে চারি কি পাঁচ বৎসরের বালিকা কহিলেন, যে "বাবা! পীতলের থালায় ত কেহ ভাত খায় না? তবে পীতলের থালা কেন দিয়াছেন?" ভৈরবনাথ, বালিকার কথায় আপনার ভ্রম বুঝিলেন। তখনই কাঁসার একখানি থালা আনাইয়া অন্নদান সাজাইয়া শ্রাদ্ধ করিলেন।

বালিকার এই সুব্যবস্থাসঙ্গত কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দেখিয়া, তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কেননা, অন্নদানের পীতলের থালার ব্যবহার, চিরদিন প্রায় সর্ব্বত্রই চলিয়া আসিতেছে, অথচ তাহার দোষ কাহারই উপলব্ধি হয় নাই। পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকা, আজি সেই দোষ দেখাইয়া দিলেন।

শরৎসুন্দরীর চারি বৎসর বয়সের ধর্ম্মানুরক্তি, মেধা ও প্রত্যুৎপন্ন মতিত্বের আর দুই একটী দৃষ্টান্ত দিয়া এই অধ্যায় শেষ করা যাইতেছে।

ভৈরবনাথের নিত্য পূজার পর, বালিকা, সেই আসনে উপবেশন করিয়া প্রত্যহই নিত্য পূজা ও জপ আদির অভিনয় করিতেন। বিশেষ প্রতিবন্ধক ভিন্ন, তাঁহার এই ধর্ম্ম প্রাণ খেলায় (?) প্রায় বিঘ্ন ঘটিত না। * ইহার পর, ভৈরবনাথের মাতা কৃষ্ণমণি দেবী, প্রত্যহ, পুরোহিতের নিকট সংস্কৃত ভাষায় বিষ্ণুর শত ও সহস্র নাম শ্রবণ করিতেন; সেখানে উপস্থিত থাকিয়া তাহা শ্রবণ করাও বালিকার একটী নিত্য কর্ম্ম ছিল। প্রত্যহ এইরূপ শুনিতে শুনিতে আশ্চর্য্য

---

* ভৈরবনাথের বাড়ীতে বৎসরের মধ্যে দোল, দুর্গোৎসবাদি পূজা পার্ব্বণ যাহা কিছু হইত; শরৎসুন্দরীও, তাহার অনুকরণে স্বতন্ত্র ভাবে সেই সমস্ত বিষয়ের আয়োজন করিতেন। তাঁহার অচলা ভক্তি এবং অপরিসীম উৎসাহে প্রায়ই, তৎসমুদায় কার্য্য অঙ্গহীন হইত না। বরং, তিনি পাঁচ বৎসর বয়স কালে এবং বিবাহ হইবার পর কর্ম্মপটু পুরোহিত দ্বারা সেই ধর্ম্মকার্য্য সকল যথা নিয়মে নির্ব্বাহ করিতেন। তাহাতে ভৈরবনাথও, আনন্দের সহিত বালিকার সহায়তা করিতেন।

মেধা বলে চারি বৎসর বয়সের সময় তিনি সেই শত ও সহস্র নাম মুখস্থ করিয়া ছিলেন।

একবার, ভৈরবনাথ, কোন কার্য্য উপলক্ষে কলিকাতা গিয়া, শরৎসুন্দরীর জন্য একখানি রেসমী ভাল শাড়ী আনিয়া ছিলেন। বালিকা, সেই পবিত্র শাড়ীখানি, অন্য সময়ে ব্যবহার না করিয়া নিত্য পূজার অভিনয় কালে পরিধান করিতেন। নিত্য পূজা কালে পিতা, পুষ্প চন্দনাদি যেরূপে প্রদান করিতেন, আরতি আদি এবং জপ যে প্রণালীতে করিতেন, বালিকা, নিপুণভাবে তাহা দেখিয়া দেখিয়া এরূপ শিখিয়াছিলেন যে, কোন কার্য্যেই প্রায় পর্য্যায় ভঙ্গ হইত না। একদিন, উক্তরূপে পূজা করিবার সময় দীপ লইয়া আরতি করিতে দৈবাৎ দীপ শীখা, তাঁহার পরিধেয় কাপড়ে লাগিয়া জ্বলিয়া উঠে। অন্য কোন শিশু হইলে সেই বিপদে আত্ম রক্ষা করিতে পারিত কিনা সন্দেহ। কিন্তু, শরৎসুন্দরী, প্রত্যুৎপন্ন বুদ্ধি বলে অব্যাকুল চিত্তে তৎক্ষণাৎ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া, তাহা অর্দ্ধ দগ্ধাবস্থায় নির্ম্মাল্য জল ফেলিবার বাটীতে ডুবাইয়া অগ্নি নির্ব্বাণ করেন। ফলতঃ এতাদৃশ ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়াও, তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না ;—পিতা সাধ করিয়া যে বস্ত্রখানি, কলিকাতা হইতে আনিয়া দিয়াছেন, তাহা, তাঁহার অসাবধানতায় দগ্ধ হইয়াছে জানিলে তিনি, মনে ব্যথা পাইবেন, এই ভাবিয়া বালিকা রোদন* করিতে আরম্ভ করিলেন।

* বাল্য হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত রোদন এবং উপবাস তাঁহার একপ্রকার নিত্যকর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। তিনি, সংসারে কোনও অত্যাহিত দেখিলে,—ইচ্ছামত দান করিতে না পারিলে, অন্যের অনুরোধে আপন মতের বিরুদ্ধে কোনও গুরুতর অপরাধীর প্রতিও শাসনের অনুমোদন করিয়া, নির্জ্জনে রোদন করিতেন, এবং আহারও প্রায় অনেক সময়েই হইত না।

তাঁহার রোদন শব্দে নিকটস্থ সকলে উপস্থিত হইয়া, এই অভাবনীয় ব্যাপার দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইল। তাঁহাকে অনেকেই বলিল যে, তাঁহার যে, জীবন রক্ষা হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট; কাপড়ের জন্য তাঁহার পিতা অনুমাত্রও ক্ষুব্ধ হইবেন না। তখন চারি বৎসরের বালিকা, রোরুদ্য বদনে গদ্‌গদ বচনে কহিলেন যে,—"বাবা ত আর সকালে কলিকাতা যাইবেন না, আর এমন কাপড়ও আনিতে পারিবেন না; কাযেই তাঁহার সাধের কাপড় পুড়িয়াছে বলিয়া আমার প্রতি রাগ করিবেন।" এই সময় ভৈরবনাথ স্বয়ং আসিয়া বালিকাকে নানা প্রকার সান্ত্বনা করিলে পর, তাঁহার রোদন নিবৃত্তি হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিবাহ,—পুঠিয়া রাজবংশ, রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ, শরৎসুন্দরীর গৃহিণীত্ব, বিদ্যাশিক্ষা এবং চরিত্রের পূর্ণবিকাশ।

ভৈরবনাথ, এইরূপ গুণবতী বালিকার বিদ্যা শিক্ষার জন্য, কোনও চেষ্টা করিতে পারেন নাই। কেননা, সে সময়ে রাজসাহী প্রদেশে বালিকার বিদ্যা শিক্ষার রীতি প্রচলিত ছিল না। কিন্তু, বালিকার প্রস্তাবিত গুণ সকল দেখিয়া তাহার ভবিষ্যৎ সুখের জন্য, ভৈরবনাথ বড়ই ব্যাকুল হইলেন। প্রথমে ভাবিলেন, শরৎসুন্দরীকে কোনও সুপাত্রে দিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি গুণবতী কন্যাকে প্রদান করিবেন। কিন্তু, সে সময়ে তাঁহার অন্য সন্তান জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং সে

সঙ্কল্প অধিককাল স্থায়ী হইল না। তাহার পরে, বিস্তর চেষ্টায় শরৎ-সুন্দরীর একটী যোগ্য বর পাইলেন।—পুঠিয়ার রাজাদিগের পৌনে তিন আনার অংশী, রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণের সহিত বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইল। ১২৬২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে, শরৎসুন্দরী, পাঁচ বৎসর সাত মাস বয়সে, রাজগৃহিণী হইলেন। *

এই স্থানে, পুঠিয়া রাজবংশের বিশেষতঃ রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণের অবস্থা সম্বন্ধে, স্থূল স্থূল বিবরণগুলি না দিলে, শরৎসুন্দরীর জীবনীর ঘটনাবলী অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়; অতএব, প্রথমে পুঠিয়া রাজবংশের আলোচনা করা যাইতেছে। যোগেন্দ্রনারায়ণের বিষয়, যথাস্থানে লিখিত হইবে।

---

* বিবাহের রাত্রিতে কোন কারণে, যোগেন্দ্র নারায়ণের মাতা রাণী দুর্গাসুন্দরী, ভৈরবনাথের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি, সেই নিমিত্ত চিরপদ্ধতি ভঙ্গ করিয়া সেই রাত্রিতেই বর বধূকে আনিয়া রাজবাটীতে বাসরশয্যার ব্যবস্থা করেন। ভৈরবনাথ এবং তাঁহার পরিবারবর্গ তাহাতে যে কতদূর মনঃপীড়া পাইয়াছিলেন, তাহা হিন্দু পাঠক মাত্রই অনুভব করিতে পারেন। সে সময়ে বালিকার সঙ্গে পিত্রালয় হইতে বিশু নামিকা একটী পরিচারিকা আসিয়াছিল। অতি হীনজাতীয়া হইলেও, বয়ঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির নাম ধরিয়া ডাকা, শরৎসুন্দরীর অভ্যাস ছিলনা। বয়স্থ অবস্থায়, তিনি প্রায়শঃই পুরুষ-দিগকে পিতৃ এবং স্ত্রীলোকদিগকে মাতৃ সম্বোধনে ডাকিতেন। পিত্রালয়ের পরিচারিকা-দিগকে "বিটি" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। রাত্রি প্রভাতা হইলে বালিকা, বিশুকে কহিলেন,—"বিশুবিটি! এ বাড়ীতে রাত্রি পোহাইল; কিন্তু বুঝি আমাদের বাড়ীতে পোয়ায় নাই।" বিশু হাসিয়া কহিল—"মা! রাত্রি কি এক বাড়ীতে পোহায় অন্য বাড়ীতে পোহায় না?" বালিকা তখন যেন অতি কষ্টে বলিলেন যে—"আমি না গেলে যে আমাদের বাড়ীর রাত্রি পোহাইবে না।" তিনি, কি, মনে করিয়া এই কথা বলিয়া-ছিলেন, তাহা, অন্তর্যামী ভগবান্‌ই জানেন; কিন্তু, ভৈরবনাথের সেই হর্ষে বিষাদের রাত্রির বৃত্তান্ত যাঁহারা জানিতেন, তাঁহারা বালিকার সেই কথা দৈববাণীর ন্যায় সত্য বলিয়া নানা অর্থ করিয়াছিলেন। এমন কি, সেই কথা শুনিয়া রাণী দুর্গাসুন্দরী, সমস্ত ক্রোধ বিস্মৃত হইয়া, সেই মুহূর্ত্তেই বর বধূকে ভৈরবনাথের আলয়ে পাঠাইয়া ছিলেন। বাস্তবিকই শরৎসুন্দরীর যাইবার পর ভৈরবনাথের বাড়ীর দুঃখের নিশি প্রভাতা হইয়াছিল।

পুঠিয়ার রাজাগণ, বারেন্দ্র শ্রেণীর কুলীন, বাগছি বংশের প্রতিষ্ঠাতা সাধুর সন্তান। সাধু হইতে পঞ্চদশ পুরুষ পর, শশধর পাঠক নামে এক-জন নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন। শশধরের বৎসাচার্য্য নামে এক পুত্র জন্মে। বৎসাচার্য্য, এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি নানা শাস্ত্রবিৎ নিষ্ঠাচারী পণ্ডিত ছিলেন। তন্ত্র এবং জ্যোতিষে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি গৃহস্থ হইয়াও সন্ন্যাসী ছিলেন। *

বৎসাচার্য্যের সাতটী পুত্র;—নীলাম্বর, পীতাম্বর, এবং পুষ্করাক্ষ ব্যতীত, আর চারি পুত্রের অকাল মৃত্যু হয়। বৎসাচার্য্য, শেষ বয়সে গৃহাশ্রম একরূপ ত্যাগ করিয়াছিলেন। পুঠিয়ার প্রায় চারি মাইল পূর্ব্ব দিকে চন্দ্রকলা গ্রামে বৎসাচার্য্যের নিবাস ছিল। প্রবাদ আছে যে, এই সময়ে বাঙ্গালার জনৈক সুবাদার (বখর খাঁকি ?) অবাধ্য হইয়া, দিল্লী সিংহাসন হইতে বঙ্গদেশকে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করেন। তাহাকে সাশন জন্য, দিল্লীশ্বর (গয়াস উদ্দীন টোগলগ, হইলেও হইতে পারেন) স্বয়ং সসৈন্যে, ঢাকা নগরের অভিমুখে যাত্রা করেন। পথে, চন্দ্রকলা গ্রামে তাঁহার শিবির সন্নিবেশিত হয়। দিল্লীশ্বর, লোক মুখে বৎসা-চার্য্যের অদ্ভুত ক্ষমতার বিষয় অবগত হইয়া, আচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং তাঁহার ভবিষ্যৎ ভাগ্য সম্বন্ধে দুইটী প্রশ্ন করেন। আচার্য্য, তদুত্তরে বলেন যে—"বঙ্গদেশ পুনরায় সম্রাটের শাসনাধীন হইবে, অবাধ্য সুবাদারও স্বকর্ম্মেই থাকিবেন। আর, এক বৎসরের মধ্যেই সম্রাটের আয়ুস্কাল শেষ হইবে;—তিনি, কোন আত্মীয়ের ষড়যন্ত্রে অপঘাত মৃত্যুর বশীভূত হইবেন।"

* কুলজ্ঞদিগের গ্রন্থ, ও প্রবাদ অবলম্বন ব্যতীত, এই রাজবংশের সম্পত্তি লাভের বিবরণ সংগ্রহের অন্য উপায় নাই। লেখক, বিস্তর অনুসন্ধানে যতদূর সাধ্য, ইহার সত্যতা আবিষ্কারের প্রয়াস পাইয়াছে।

দিল্লীশ্বর, উল্লিখিত কথায় প্রথমে আস্থা করিয়াছিলেন না। কিন্তু, ঘটনাচক্রে তাঁহাকে আর ঢাকা পর্য্যন্ত যাইতে হইয়াছিল না। পথেই সুবাদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল; এবং সুবাদারের সদ্ব্যবহারে তাঁহাকেই সুবাদারীতে নিযুক্ত রাখিলেন; আচার্য্যের উক্তির প্রথমাংশ সফল হইল। দিল্লীশ্বর, প্রত্যাগমন কালে আচার্য্যের পর্ণ কুটীরে গিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন, এবং তাঁহাকে কিছু সম্পত্তি দিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু, আচার্য্য পার্থিব সম্পত্তি দিয়া কি করিবেন? তিনি, যোগানন্দে পরম ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন, অতএব আচার্য্য ঘৃণার সহিত সম্রাটের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন।

এই সময়ে সম্রাটের সঙ্গে বঙ্গের সুবাদারও ছিলেন। বৎসাচার্য্যের ভবিষ্যদ্বাণী, আপনার অনুকূল হইয়াছিল বলিয়া, তিনি, হিন্দু ফকীরের উপকারের জন্য, দৃঢ়তার সহিত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সন্ধানে বৎসাচার্য্যের পুত্র নীলাম্বর ও পীতাম্বর অবিলম্বে সম্রাটের নিকট আনীত হইল। দৈব ঘটনায়, ঐ প্রদেশের জায়গীরদার লস্কর খাঁর* মৃত্যু সংবাদ, সম্রাটের কর্ণগোচর হইল। লস্কর খাঁর জায়গীর লস্করপুর নামে প্রসিদ্ধ। সম্রাট, নীলাম্বর ও পীতাম্বরকে লস্করপুর জায়গীর প্রদান করিলেন। তদ্ভিন্ন পীতাম্বরকে দিল্লী নগরের সহর মণ্ডলের সম্মানিত পদে নিযুক্ত করিয়া আপনার সঙ্গে লইলেন। দিল্লী যাইয়া পীতাম্বর, নূতন কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। দিল্লী নগরের একটী নব নির্ম্মিত তোরণ পতিত হইয়া সম্রাট মানবলীলা সম্বরণ করেন। পীতাম্বর, আশ্রয়দাতার অপঘাত মৃত্যুতে স্বদেশে চলিয়া আইসেন। অল্পদিনের মধ্যে তাঁহারও আয়ুঃশেষ হয়।

---

* লস্করপুরের অধীন আলাইপুর গ্রামে লস্কর খাঁর আবাস বাটী ছিল। আলাইপুর, পদ্মানদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত।

সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুষ্করাক্ষ, তাহিরপুরের ভৌমিক রাজাদিগের রাজধানী রামরামা গ্রামেই সর্ব্বদা থাকিতেন। ভাগ্য প্রসন্ন হইলে চারিদিক হইতে নানা বিভব আসিয়া থাকে। এই সময়ে তাহিরপুরের রাজারা দুই সহোদর ছিলেন, এবং ছোট রাজা, পুষ্করাক্ষকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাঁহার কোনও সন্তান সন্ততি ছিল না, সেই নিমিত্ত অতি নির্ব্বিণ্ণ হৃদয়ে অসার সংসার মায়া ত্যাগ করিয়া বারাণসী ধামে গমন করেন। যাইবার সময় তাঁহার অর্দ্ধ অংশ সম্পত্তি, স্নেহভাজন পুষ্করাক্ষকে প্রদান করেন। লস্কর খাঁর জায়গীর ও তাহিরপুরের অংশ সহ, মোট ২২টী পরগণার মাহাল লইয়া বর্ত্তমান লস্করপুরের আয়তন। পুঠিয়া রাজবংশ, তাহারই স্বত্বাধিকারী। পুষ্করাক্ষও নিঃসন্তানে ইহলোক ত্যাগ করেন বলিয়া, নীলাম্বরই সমস্ত সম্পত্তি লাভ করিলেন। পুঠিয়ার বর্ত্তমান ভূম্যাধিকারীগণ, সেই নীলাম্বরের বংশধর। বৎসাচার্য্যের পাদুকা যুগল, পুঠিয়া রাজধানীতে অদ্যাপি দেববৎ পূজিত হইয়া থাকে। এই কাষ্ঠ পাদুকা (খড়ম) প্রায় ১৬ ইঞ্চ লম্বা। ইহা দ্বারা জানা যায়, যে, পূর্ব্বকালের মনুষ্য দেহ কিরূপ উন্নত ছিল।

নীলাম্বরের পুত্র আনন্দরাম, বঙ্গের সুবাদার ফকিরুদ্দিন কর্ত্তৃক রাজোপাধি লাভ করেন। এই বংশ, রাজোপাধি ও বিস্তৃত সম্পত্তি ভোগ করিলেও, বহু পুরুষ পর্য্যন্ত বৎসাচার্য্যের সদাচার ও যোগ নিষ্ঠা প্রচলিত ছিল; সেই জন্য, ইহাঁর পুত্র রতিকান্তকে দেশস্থলোকে পূজনীয় "ঠাকুর" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। পরে বঙ্গের সুবাদার কর্ত্তৃকও ঐ উপাধি অনুমোদিত হয়; সেই হইতে পুঠিয়ার রাজবংশকে সাধারণে ঠাকুর নামে অভিহিত করিয়া থাকে। * যোগেন্দ্রনারায়ণ,

* কুচবিহারের আহেলকার (কালেক্টর ম্যাজিষ্ট্রেট) বাবু যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সংগৃহীত কুলশাস্ত্র দীপিকার ৫১ পৃষ্ঠা হইতে ৫৫ পৃষ্ঠায় পুঠিয়া রাজকুলের বংশাবলীর

এই পবিত্রকুলে ১২৪৭ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের তৃতীয় দিবসে জন্মগ্রহণ করেন। যোগেন্দ্রনারায়ণ, বৎসাচার্য্য হইতে ত্রয়োদশ পুরুষ ব্যবধান। বিবাহকালে তাঁহার বয়স পোনর বৎসর মাত্র হইয়াছিল।

শরৎসুন্দরী, সাড়ে পাঁচ বৎসর বয়সে বধূরূপে পুঠিয়া রাজধানীতে গমন করিলেন। সে সময়ে যোগেন্দ্র নারায়ণের মাতা রাণী দুর্গাসুন্দরী, বালিকা বধূকে কোলে লইয়া বড়ই আহ্লাদিতা হইলেন। দুঃখের বিষয় এই যে অল্প দিনের মধ্যেই তিনি, অতৃপ্ত জীবনে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছিলেন। যোগেন্দ্র নারায়ণের বিস্তৃত ভূম্যধিকার, তাঁহার বিবাহের পূর্ব্ব হইতে কোর্ট অব ওয়ার্ডেশের (court of word's) তত্ত্বাবধানে ছিল। † তাঁহার মাতার লোকান্তর গমনের পর, বালিকা শরৎসুন্দরীর শ্বশুর গৃহে, অন্য কেহ অভিভাবিকা

বিস্তৃত বিবরণ আছে। তাহার সহিত এতদ্দেশীয় কুলজ্ঞ গ্রন্থের একটী নামের কিছু ব্যতিক্রম ঘটে। বৎসাচার্য্যের ষষ্ঠ পুত্রের নাম, কুলশাস্ত্র দীপিকায় "পুরন্দর" লিখিত আছে; এ দেশের জন প্রবাদ ও কুলজ্ঞ গ্রন্থ অনুসারে তাঁহারনাম পুষ্করাক্ষ ও মজুমদার উপাধি প্রাপ্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। পুঠিয়া বংশের ও বারেন্দ্র শ্রেণীর অনেকগুলি বিবরণ, এই লেখকের প্রণীত "পিশাচ সহোদর" নামক ঐতিহাসিক আখ্যায়িকায় কিছু বিস্তৃতভাবে আছে।

† যোগেন্দ্র নারায়ণের সম্পত্তি, কেবল লস্কর পুরের পৌনে তিন আনা মাত্রই ছিল না। রাজসাহী জেলার পরগণে কালীগাঁ ও মৈমন সিং জেলার পরগণে পুখরিয়া প্রভৃতি বিস্তর সম্পত্তি, তাঁহার প্রপিতামহ ভুবনেন্দ্র নারায়ণ ও পিতামহ জগন্নারায়ণ রায়ের স্বোপার্জ্জিত ছিল। যোগেন্দ্র নারায়ণের অপ্রাপ্ত বয়স্ক কালে, তাঁহার সম্পত্তি নামে মাত্র কোর্ট অব ওয়ার্ডেশের তত্ত্বাধীনে ছিল। বাস্তবিক সমস্ত সম্পত্তি ইজারা বিলি হইয়াছিল। রাজসাহী জেলায় সম্পত্তি, তদানীন্তন রাজসাহীর রেশম ও নীলের ব্যবসায়ী প্রবল প্রতাপ রবার্ট ওয়াটসন (Rubart watson and co.) কোম্পানীর সহিত এবং মৈমন সিংহের সম্পত্তি K. broudy মিঃ কেবার্ডি সাহেবের সহিত ইজারা বন্দোবস্ত ছিল। ম্যানেজার, নির্ব্বিবাদে কেবল দুই ইজারদারের নিকট টাকা আদায় করিয়া সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু, এই ইজারাই যোগেন্দ্র নারায়ণের প্রতিভা প্রকাশের এবং অকাল মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। তাহা যথাস্থানে বর্ণিত হইবে।

ছিলনা। সুতরাং তিনি অল্পদিন মাত্র পিতৃভবনে ছিলেন। পরে যোগেন্দ্রনারায়ণ, স্বয়ং শিশু পত্নীর তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। একটী বিধবা মাতুলানীকে * আনিয়া শরৎসুন্দরীর নিকটে রাখিয়া দিলেন। যোগেন্দ্র নারায়ণকে বিদ্যা শিক্ষার্থ এই সময়ে রামপুর বোয়ালিয়ায় থাকিতে হইয়াছিল, সুতরাং তিনি শরৎসুন্দরীকে ভৈরব নাথের রক্ষণে স্বচ্ছন্দে রাখিতে পারিতেন। কিন্তু যোগেন্দ্র নারায়ণ, সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি অল্প বয়স হইতেই সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী, প্রতিভাবান্ এবং তেজস্বী ছিলেন। পিত্রালয়ে থাকিলে বালিকার স্বেচ্ছাচার প্রবল হইয়া নৈতিক উন্নতির ব্যাঘাত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় তাঁহাকে পিতৃভবনে না পাঠাইয়া সঙ্গেই রাখিয়া ছিলেন। এখন সেই মাতুলানীই শরৎসুন্দরীর অভিভাবিকা হইলেন।

এই বিধবাও ধর্ম্মনিষ্ঠা ও সুশীলা ছিলেন, এবং শরৎসুন্দরীকে আপনার কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন। বালিকাও তাঁহাকে অসাধারণ ভক্তি করিতেন; বিধবার চরিত্র, শরৎসুন্দরীর মূল প্রকৃতির অনুকূল বলিয়া, তাঁহার হাতে তিনি আত্ম সমর্পণ করিয়া সুখী হইয়াছিলেন। এই ধর্ম্মশীলা বিধবার নিকটেও, শরৎসুন্দরী, আপনার চরিত্র গঠনের অনেক সাহায্য পাইয়া ছিলেন। শরৎসুন্দরীকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য যোগেন্দ্র নারায়ণ, কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতেন। তিনি, সর্ব্বদাই ভাল ভাল খেলনা, উত্তম উত্তম বস্ত্র, অলঙ্কার, নানা উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী আনিয়া দিয়া, বালিকাকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেন।

---

* ইহাঁর নাম হরসুন্দরী দেবী। ইনি, যোগেন্দ্রনারায়ণের মাতার খুড়তত ভ্রাতৃবধূ। ইনি ব্যতীত যোগেন্দ্রনারায়ণের মাতার সহোদরা ভগ্নী, শিবসুন্দরী দেবীও অনেক সময় শরৎসুন্দরীর নিকটে থাকিতেন। শরৎসুন্দরী, ইহাঁদের দুই জনকে মাতার ন্যায় ভক্তি করিতেন।

এবং অতি সন্তর্পণে বালিকার রুচি ও চেষ্টা পরীক্ষা করিতেও ত্রুটী করিতেন না। পরীক্ষা দ্বারা তিনি অল্পদিনেই জানিতে পারিলেন যে, এই ছয় বৎসরের বালিকা, খেলা করিতে কিম্বা বস্ত্র অলঙ্কারের পারিপাট্যে মুগ্ধা নহেন। বালিকা, দরিদ্রকে দান, অতিথি সেবা এবং দেবকার্য্যাদি ব্যপদেশে সকলকে ভোজন করাইতে বড়ই আগ্রহশীলা। সুতরাং যোগেন্দ্রনারায়ণ, অতি হৃষ্ট চিত্তে বালিকার সেই সকল অভিলাষ পূর্ণ করিতে লাগিলেন। যোগেন্দ্র নারায়ণের প্রদত্ত উপাদেয় খাদ্য, বালিকা, সকলকে বিতরণ না করিয়া খাইতেন না। ভাল একখানি কাপড়, অল্পদিন পরিয়াই কোনও দরিদ্রকে দিতেন। এই সময়ে যোগেন্দ্র নারায়ণের সমবয়স্ক কতিপয় বালক, তাঁহার সঙ্গে একত্র থাকিয়া বিদ্যাভাস করিতেন। শরৎসুন্দরী, সেই বিধবা ঠাকুরাণীর সহায়তায় তাহাদিগের সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান করিতেন।*

প্রস্তাবিত সৎকর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠানে শরৎসুন্দরী, বড়ই আনন্দ

* যোগেন্দ্র নারারায়ণের সেই সময়ের একজন সহাধ্যায়ী সহচর, একদিন লেখকের নিকট, শরৎসুন্দরীর গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে কান্দিয়া বলিলেন, যে, ছয় সাত বৎসরের বালিকার হৃদয়ে এত দয়া, এত পর দুঃখ কাতরতা, এত ত্যাগ স্বীকার ছিল যে, অনেক সময় তাহা ভোজ বিদ্যার ভেল্‌কীর ন্যায় বোধ হইত। অন্য লোকে শুনিয়া তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন না। রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ, আমার বয়সের কিছু বড় হইলেও, তিনি আমাকে বয়স্যের ন্যায় দেখিতেন। অন্তঃপুরে যাইতে আমার বাধা ছিল না। বরং পীড়িত হইলে অন্তঃপুরেই থাকিতাম। একবার আমি প্রবল জ্বরে বড়ই কাতর হইয়াছিলাম। সেই বিধবা ঠাকুরাণী আমাকে সর্ব্বদাই দেখিতেন, তথাপি বালিকা শরৎসুন্দরী, অবগুণ্ঠনে আবৃতা হইয়া সহোদরার ন্যায় আমার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। আমার জন্য, তাঁহার সময়ে স্নান আহার পর্যান্ত ছিল না। ইহা ভিন্ন তিনি, প্রবীণার ন্যায় দুই সন্ধ্যা আমাদিগের অভাবের তত্ত্ব লইতেন। সাত বৎসরের বধূ রাণীর কার্য্য তৎপরতায় আমাদের আহার, জলখাবার কিম্বা পীড়ার সময় ঔষধ পথ্যাদির জন্য কোন কষ্টই হইত না।

পাইতেন। যোগেন্দ্রনারায়ণের আদরে, ক্রমে ক্রমে বালিকা, কেন এক নূতন জগতে উপস্থিত হইলেন। বালিকার হৃদয়, ধীরে ধীরে যোগেন্দ্র-নারায়ণের বশবর্ত্তিনী হইয়া উঠিল। তখন বিবাহের কথা, মনে উদয় হইয়া যোগেন্দ্রনারায়ণের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বুঝিয়া লইলেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার অভিভাবিকা, প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে যোগেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ এবং তাঁহার প্রতি বালিকার কর্ত্তব্যগুলি যাহা বুঝাইতেন, বালিকা, তাহা আপনার হৃদয়ে অতি গোপনে রক্ষা করিতেন। সীতা-চরিত্র, সাবিত্রী-চরিত্র, অতি আগ্রহের সহিত শুনিতেন, আর চিত্তকে সেই পবিত্রতায় লইতে চেষ্টা করিতেন। যোগেন্দ্রনারায়ণের ভালবাসা লইবার জন্য বালিকার হৃদয় সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিত। ক্রমে ক্রমে তিনি, যোগেন্দ্রনারায়ণের নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি যতই বুঝিয়া লইলেন, তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রও, ক্রমে ততই প্রশস্ততা লাভ করিল। তিনি, যোগেন্দ্রনারায়ণেয় যখন যাহা প্রয়োজনীয়, তাহা অতি পরিপাটীরূপে প্রস্তুত রাখিতেন। কোনও কার্য্যে প্রায় দাস দাসীর সাহায্য লইতেন না। অথচ, কোন প্রকারে প্রগল্‌ভতা কি নির্লজ্জতাও প্রকাশ পাইত না; ইহাতে যোগেন্দ্রনারায়ণও আস্তে আস্তে সেই বালিকার বশবর্ত্তী হইয়া উঠিলেন। উভয়ের এই বাল্যদাম্পত্য সুখের সময়, অকস্মাৎ এক বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সময়ে কলিকাতা নগরে অপ্রাপ্তবয়স্ক ভূম্যধিকারীদিগের রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষার জন্য wards institution নামে একটী শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রসিদ্ধ বিদ্বান, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাহার অধ্যক্ষ হইলেন।

রেবিনিউ বোর্ডের আদেশে যোগেন্দ্রনারায়ণকে সেই শিক্ষাগারে গমন করিতে হইল। কলিকাতা যাইবার সময়, শরৎসুন্দরীর কথা

ভাবিয়া, যোগেন্দ্রনারায়ণ বড়ই ব্যাকুল হইলেন। বালিকাও প্রস্তাবিত ঘটনায় উন্মনা হইলেন। অথচ, মুখে কাহারই নিকট সে ভাব প্রকাশ করিতে পারেন না। যোগেন্দ্রনারায়ণ, কলিকাতা এই নূতন যাই-তেছেন, বিশেষতঃ তাঁহাকে ভিন্ন স্থানে বন্দীর মত বাস করিতে হইবে; সুতরাং শরৎসুন্দরীকে কোথায় রাখিবেন, তাহা ভাবিয়াই অস্থির হইলেন। অনেক চিন্তা করিয়া শেষে, সেই মাতুলানীর অভিভাব-কতায় তাঁহাকে পুঠিয়ার রাজবাটীতে রাখাই স্থির করিলেন। শরৎ-সুন্দরীর বয়স, এখন নয় বৎসর। যোগেন্দ্রনারায়ণ, যে তাঁহার হৃদয়ে ঘোর আধিপত্য লাভ করিয়াছেন, পুঠিয়া যাইবার সময়, তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন। বালিকার স্বামীবিচ্ছেদ যাতনা অসহ্য হইয়া উঠিল। যোগেন্দ্রনারায়ণ, এখন আর তাঁহাকে বালিকাবৎ ব্যবহার করিতেন না। যাইবার সময় তিনি, মিষ্ট কথায় বালিকাকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিলেন। বালিকার মুখে কোনও কথাই নাই, তিনি কেবল অধোবদনে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া যোগেন্দ্রনারায়ণও স্থির থাকিতে পারিলেন না; তাঁহার সাহসী হৃদয়ও গলিয়া গেল। সে সময়ে তিনিও অপনার হৃদয়ের উপর, বালিকার আধিপত্য বুঝিতে পারিলেন। পরস্পরের এই বিচ্ছেদ হইতে, উভয়েই ভালবাসার প্রভাব জানিতে পারিলেন। যোগেন্দ্রনারায়ণ, আপনার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে বলিয়া দিলেন, যে, শরৎসুন্দরী, যখন যাহা চাহিবেন, যখন যে বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ করিবেন, তাহাই যেন সম্পাদন করা হয়। কর্ম্মচারী, হাসিয়া কহিল—"মা যদি বাপের বাড়ী যাইতে চাহেন, তবে কি করিব?" যোগেন্দ্রনারায়ণ কহিলেন—"অবশ্যই যাইতে দিবা। কিন্তু আমার বিশ্বাস, কোন বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত, শরৎ, পিত্রালয়ে

যাইতে চাহিবে না।” * এই বলিয়া তিনি, শরৎসুন্দরীকে পুঠিয়াতে রাখিয়া স্বয়ং কলিকাতা প্রস্থান করিলেন।

শরৎসুন্দরী, পুঠিয়া যাইয়া কখনও স্বামীর ভবনে, কখনও বা পিতৃ-নিবাসে থাকিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বামিগৃহে কর্ত্তৃপক্ষের কেহ না থাকায়, তিনি নয় বৎসরের বালিকা হইলেও এখন গৃহিণী। দেব-সেবা, অতিথি সেবা, সমাগত আত্মীয় স্বগণদিগের অভ্যর্থনা, তাঁহাকেই করিতে হইত। কর্ম্মচারীরা, তাঁহাকেই সকল বিষয় জানাইতেন,—অনেক কার্য্যে তাঁহার অভিমত গ্রহণ করিতেন। কিন্তু, বালিকা তাহাতে প্রবীণার ন্যায় সাবধানতা রক্ষা করিতেন। কোনও বিষয় উপস্থিত হইলে, প্রাচীন কর্ম্মচারীদিগের অভিপ্রায় এবং পূর্ব্বাপর পদ্ধতি জানিয়া লইয়া, অতি সাবধানে উত্তর দিতেন। কিন্তু, কোনও বিষয়েই স্বাধীনতার পরিচয় দিতেন না, কিম্বা পুরাতন কর্ম্মচারীদিগের ইচ্ছার প্রতিকূলতাও করিতেন না। বরং অনেক স্থলেই তাঁহার আপনার অভিমত প্রায় ব্যক্ত করিতেন না। কেননা তিনি, আপনার বয়স এবং বধূত্বভাব অনুসারে আপনার ক্ষমতা বুঝিতে পারিতেন। সাধারণ গৃহকার্য্যে পর্য্যন্ত সেই বিধবা ঠাকুরাণীর ছন্দানুবর্ত্তী হইয়া আপনার বধূত্বরক্ষা করিয়া চলিতেন। সময় সময় স্বহস্তে পাক, পরিবেশনাদি কার্য্যও করিতেন। তাঁহার শরীর, স্বভাবতঃ কিছু স্থূল বলিয়া পরিশ্রম-সাধ্য কার্য্যে তত সুপটু ছিলেন না। অথচ বসিয়াও থাকিতেন না।

* যোগেন্দ্রনারায়ণ, যাহা বলিয়াছিলেন, কার্য্যেও তাহাই হইয়াছিল। বিশেষ কোন পার্ব্বণ কিম্বা উৎসব ব্যতীত, শরৎসুন্দরী পিত্রালয়ে যাইতেন না। আর যাইবার পূর্ব্বে যোগেন্দ্রনারায়ণের অনুমতি আনাইতেন। যোগেন্দ্রনারায়ণ, এই বালিকার হৃদয় উত্তমরূপে পাঠ করিয়া বুঝিয়াছিলেন, যে, কোনও ঘটনাতেই বালিকার পবিত্রতার বিঘ্ন হইবে না। সুতরাং তাঁহার অনুমতিতে বালিকা, কোন কোন সময়ে, কতক দিনের জন্য পিত্রালয়েও অবস্থিতি করিতেন।

যোগেন্দ্রনারায়ণ, কলিকাতা হইতে সর্ব্বদাই পত্র দ্বারা শরৎসুন্দরীর তত্ত্ব লইতেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার হৃদয় আশ্বস্ত হইত না। তাঁহার ইচ্ছা হইত, শরৎ লিখা পড়া শিখিলে, আপনার হাতে তাঁহাকে পত্র লিখিতে পারিত, আর তিনিও তাহাকে মনেরভাব লিখিয়া, চিত্তের ভারলাঘব করিতে পারিতেন। তিনি, এইরূপ নানা চিন্তায় সর্ব্বদাই উন্মনা থাকিতেন। কলিকাতায় তাঁহার চক্ষে কিছুই ভাল বোধ হইত না। তিনি কেন, তৎকালে এই শিক্ষালয়ে যাঁহারা থাকিতেন, তাঁহারাই আপনাকে বন্দীর মত বিবেচনা করিতেন। এই শিক্ষালয় স্থাপনের পর, প্রথম প্রথম বড়ই কঠিন নিয়মের প্রবর্ত্তনা হইয়াছিল। ধনী-সন্তানেরা সেস্থানে বাস করিয়া শয়ন, উপবেশন, ভোজন, ভ্রমণ, সকল কার্য্যেই এককালে পরাধীন ছিলেন। আপনার আত্মীয় লোকের সহিত দেখা সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত সহজে ঘটিত না। * যোগেন্দ্রনারায়ণ, এখন প্রস্তাবিত অভাব মোচনের জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প হইলেন। তিনি, স্থির করিলেন, এবার বাড়ীতে গিয়া শরৎসুন্দরীকে লিখা পড়া শিখইবার সদুপায় করিবেন। কলেজ বন্ধ হইলে অধ্যক্ষের নিকট বিদায় লইয়া অনেক ধনী সন্তানই, আপনার বাড়ীতে যাইতেন। যোগেন্দ্র-

* লেখক, কোনও কারণে এই শিক্ষাগারের শেষ সময়ে সংসৃষ্ট থাকায়, অনেক বিষয় স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছে। শেষ সময়ে যদিচ পূর্ব্বের মত কঠোর নিয়ম ছিল না, কিন্তু যাহা ছিল, তাহাতেই স্বাধীন চিত্তের ধনী সন্তানেরা অনেক বিষয়ে অকারণে প্রসন্নতা হারাইতেন। পড়া শুনায় অনেকেরই মনোনিবেশ হইত না। সকলেই আপনাকে বন্দীর মত বিবেচনা করিয়া, স্বাধীন কার্য্যের অবসর অনুসন্ধান করিতেন। সময়ে সময়ে সকলে পরামর্শ করিয়া তত্ত্বাবধায়ককে বঞ্চনা করিতেও ক্রটী করিতেন না। ফলতঃ অতি শৈশবে এই শিক্ষাগারে প্রবেশে সুশিক্ষার যেরূপ সুবিধা ছিল, ১৫।১৬ বৎসরের বালকদিগের সুশিক্ষার পক্ষে ততোধিক অসুবিধা হইত। গবর্ণমেণ্ট, ইহার ফল দেখিয়াই, ইহা এখন তুলিয়া দিয়াছেন। যোগেন্দ্রনারায়ণদিগের সময়ে এখানে বিস্তর বীভৎসকাণ্ডের অভিনয় হইয়াছিল।

নারায়ণ, সেই উপলক্ষে বাড়ীতে আসিয়া শরৎসুন্দরীকে লেখা পড়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অল্প দিনেই দেখিলেন, যে, বালিকা, এই কার্য্যে সম্ভবাতীত ফললাভ করিয়াছে। কিন্তু, ছুটীর কাল শেষ হইবার পূর্ব্বেই কলিকাতা যাইতে হইল। সুতরাং একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর * প্রতি শরৎসুন্দরীর বিদ্যা শিক্ষার ভার অর্পণ করিয়া কলিকাতা গমন করিলেন।

অতি অল্পদিনের মধ্যে, শরৎসুন্দরী কর্ত্তৃক যোগেন্দ্রনারায়ণের অভিলাষ পূর্ণ হইল। বালিকা, স্বয়ং যোগেন্দ্রনারায়ণকে পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন। দৈনিক অল্প অল্প শিক্ষায় দুই বৎসরের মধ্যে শরৎসুন্দরী ভাল ভাল পুস্তক পড়িতে ও বুঝিতে পারিতেন। †

তাঁহার হস্তাক্ষর ছাপার মত হইয়াছিল। যোগেন্দ্রনারায়ণ, কলিকাতার শিক্ষাগারে প্রায় দুই বৎসরকাল ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে চারি পাঁচ বার বাড়ীতে আসিয়া, শরৎসুন্দরীর বিদ্যা শিক্ষা এবং চরিত্রের উন্নতি দেখিয়া বড়ই সুখী হইয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে বালিকা-হৃদয়ে প্রগাঢ় পতিভক্তিও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। যোগেন্দ্রনারায়ণ, কলিকাতা হইতে আসিবার সময়, বালিকা প্রণয়িণীর পরিতোষের জন্য নানাবিধ বিলাস দ্রব্য, উত্তম উত্তম পরিচ্ছদাদি আনিতেন; বালিকাও পতির প্রীতি বর্দ্ধনের জন্য তাহা সাদরে লইয়া, দুই চারিদিন ব্যবহার

* এই ব্যক্তির নাম ঈশানচন্দ্র সেন, জাতিতে বৈদ্য; এবং পুঠিয়াতেই ইহাঁর নিবাস।

† তাঁহার জীবনে প্রত্যহ পুস্তক ও সংবাদপত্র পাঠ একটী নিত্যকর্ম্মের মধ্যে ছিল। যে সময়ে তিনি, পতির ত্যক্ত সম্পত্তির কর্ত্তৃত্ব করেন, সে সময়ে তাঁহার নামিক সমস্ত পত্র, তিনি স্বয়ং পাঠ করিতেন। এইরূপ অভ্যাসের জন্য অতি অল্পশিক্ষিত হইতে সুশিক্ষিতদিগের অসম্পূর্ণ কদর্য্য অক্ষরও অবাধে পড়িতে পারিতেন। এবং তাহার ভাব উদ্ধারে কৃতকার্য্য হইতেন। ইহা ভিন্ন সংস্কৃত পুস্তকও তিনি বিশেষ মনোযোগের সহিত পড়িতেন; আর পুরোহিতদিগের নিকট তাহার ব্যাখ্যা সহ অর্থ শুনিতে শুনিতে সংস্কৃত ভাষাতেও তাঁহার প্রবেশিকা শক্তি জন্মিয়াছিল।

করিতেন। কিন্তু, পরে সে সমুদয় দ্রব্য আর তাঁহার ব্যবহারে আসিত না। বালিকা, এই বয়সে কোন অলক্ষিত কারণে, বেশবিন্যাস-পারিপাট্য কিম্বা আহার বিহারাদিতে, স্পৃহাহীনা হইয়াছিলেন।

শরৎসুন্দরী বৃথা আমোদে এক মুহূর্ত্তের জন্যও লিপ্ত হইতেন না। এই সময়ে, তাঁহার শরীরে দয়া, মায়া, সদাচার, ক্ষমা এবং পরদুঃখকাতরতাদি গুণ, স্পষ্ট দেখা যাইত। তিনি তত বিখ্যাত সুন্দরী ছিলেন না; অথচ, তাঁহার শান্তিময় মুখচ্ছবিতে প্রস্তাবিত গুণসমূহের মিশ্র লাবণ্য যেরূপ ছিল,—অন্যে সেই সকল গুণের পক্ষপাতিতায় তাঁহার প্রতি যেরূপ আকৃষ্ট হইত, এরূপ, অন্য পরমাসুন্দরী ললনাসম্বন্ধেও অল্পই দেখা যায়। তাঁহার অতি সংক্ষিপ্ত, সরল, বিনীত ভাষায় সকলেই বশীভূত হইয়াছিল। কিন্তু, সকলের ভাগ্যে সেই আনন্দ অনুভব করিবার সুবিধা হইত না। তাঁহার নিকটে যে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক লোকে যাইতে পারিত, তাঁহাদের সকলের সহিত বধূরূপা শরৎসুন্দরী, কথা কহিতেন না। কিন্তু তাহা বলিয়া, তাঁহার গুণ অপ্রকাশ রহিল না। শরৎসুন্দরী তাঁহার সুশীলা মাতার চরিত্র লাভ করিয়া, অভিভাবিকা বিধবা ঠাকুরাণীর ছন্দোনুবর্ত্তিতায়, পতির সংসারে একমাত্র গৃহিণী হইয়া, নানা প্রকার কার্য্যে সুশিক্ষিতা হইয়াছিলেন। তাঁহার মাতার চরিত্রের বিষয় সংক্ষেপে পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। তথাপি তাঁহার পূর্ণ চিত্র এস্থানে দিলে, শরৎসুন্দরীর স্বভাব বুঝিবার অনেক সুবিধা হইতে পারে বলিয়া, পুনরুল্লেখ করা যাইতেছে।

সংসারে স্ত্রী, পুরুষ, উভয় শ্রেণীর মধ্যেই দেখা যায় যে, এক শ্রেণী সচ্চরিত্র অথচ প্রতিভাশালী, এবং প্রভুত্বপ্রিয়। তিনি, আপনি যে যে গুণের পক্ষপাতী, অন্যকে উপদেশ দিয়া, সেই গুণে সংগঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। আর অন্য শ্রেণীর লোকের সদাচার ও

স্বধর্ম্ম রক্ষায় প্রতিভা থাকিলেও, প্রভুত্বপ্রিয়তা থাকে না। তাঁহাদের চরিত্র নির্ম্মল, তথাপি, চিরজীবন স্বাবলম্বনে প্রবৃত্তি হয় না; সর্ব্বদাই অন্যের অধীনতায় থাকিতে ভাল বাসেন, অতএব অপরিণত বয়স্ক বালক বালিকারাও, তাঁহাদিগের উপর প্রভুত্ব করিবার অবসর পায়। শরৎসুন্দরীর গর্ভধারিণী দ্রবময়ী * প্রস্তাবিত শেষ জাতীয়া ছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে প্রগাঢ় মহত্ব থাকিলেও এককালে, আড়ম্বর শূন্যা ছিলেন। তাঁহার কথাবার্ত্তা এবং সাংসারিক কার্য্যের সীমা অতি সঙ্কীর্ণ ছিল। তিনি, পরিণতবয়স্কা হইয়াও, বধূস্বভাবাপন্না। কোনও কার্য্যেই কর্ত্তৃত্ব কিম্বা অতি তুচ্ছ কার্য্যও অন্যকে জিজ্ঞাসা না করিয়া করিতেন না। মাননীয় ব্যক্তির ছন্দোনুবর্ত্তী হইয়া যতদূর সাধ্য, সর্ব্বদাই দাসীর ন্যায় কার্য্যলিপ্তা থাকিতেন। একজন বালিকাকেও তিনি ভয় করিতেন; অপরিচিত দ্বাদশ বৎসরের বালকের নিকটেও তিনি অবগুণ্ঠনাবৃতা হইতেন। কেহ হঠাৎ একটা অপচয় করিয়া, নিরপরাধা অবগুণ্ঠনবতী দ্রবময়ীর উপর দোষ নিক্ষেপ করিয়া আত্মশুদ্ধি করিলেও, তিনি প্রতিবাদ করিতেন না। অন্যে তাঁহার ঘোরতর অপকার করিলেও, অম্লান হৃদয়ে ক্ষমা করিতেন। প্রকৃত দোষী মনে কষ্ট পাইবে বলিয়া, বরং তিনি আপনার অপকার ভুলিয়া, দোষীকেই আবার মিষ্ট কথায় সান্ত্বনা করিতেন। সামান্য নৃশংসতা কি নিষ্ঠুরতা দেখিলেই, তিনি ভয়ে মূর্চ্ছিতা হইতেন। পরের দুঃখ দেখিলে, কারুণ্যে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইত, অথচ প্রগল্‌ভতার ভয়ে, পতি ব্যতীত অন্যের নিকট কোনও বিষয় অনুরোধ করিতে সাহস করিতেন না। তাঁহার কোনও কার্য্যেই, অপ্রতিহত বাসনার পরিচয়

* ইঁহার পিতার নাম নবকান্ত ভাদুড়ী রাজসাহী জেলার অধীন হাটরা গ্রামে তাঁহার নিবাস।

ছিল না। স্বয়ং কোনও দান কি ব্রত নিয়ম করিতে অন্যের কর্ত্তৃত্বের অধীনা হইয়া বিনা আড়ম্বরে নির্ব্বাহ করিতেন। কোনও বস্তু কি কার্য্য তাঁহার নিতান্ত আবশ্যক হইলেও প্রায়ই প্রকাশ করিতেন না। কেবল মাত্র পাক পরিবেশনাদি নিত্যকার্য্যে তাঁহার বিশেষ আনুরক্তি ছিল।

শরৎসুন্দরী, মাতার ঐ সকল গুণের অধিকাংশই অধিকার করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার সুতীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং প্রশস্ত কার্য্য-ক্ষেত্র থাকায়, তাঁহার প্রতিভা, কার্য্যপটুতা এবং অনুষ্ঠানতৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি, অল্প বয়স হইতেই কার্য্যসমূহের শ্রেণী ও সুশৃঙ্খলা স্থাপনে কর্ত্তব্যতা ও প্রকারাভিজ্ঞতার পরিচয় দিতেন। তাঁহার চিত্তে অবৈধ কর্ত্তৃত্ব স্পৃহা না থাকিলেও, তিনি, মৃদুভাবে সুকৌশলে প্রায় সমস্ত কার্য্যেরই তত্ত্বাবধান করিতেন। হৃদয়ের স্বাভাবিক কর্ত্তব্য-প্রবণতার উৎসাহে, অতি মিষ্ট ব্যবহারে প্রতিকূল ব্যক্তিকেও, অনুকূলে আনিয়া সকল কার্য্যই সুসম্পন্নের চেষ্টা করিতেন। তাঁহার কার্য্যে আড়ম্বর না থাকিলেও, তিনি, অনেক বিষয়ে উদ্ভাবিকা শক্তির চমৎকার পরিচয় দিতেন। তিনি, আপনার ঘোর বিপদেও বিশেষ ব্যাকুল হইতেন না। আপদ বিপদ সমস্তই আত্মকর্ম্মজ ফল, আর আপনার পাপ শান্তিকর বিবেচনায় নতশিরে সমস্ত সহ্য করিতেন। অথচ, তাঁহার সাংসারিক কার্য্যে গাঢ় আসক্তি না থাকিলেও, কোন কর্ত্তব্যতা সাধনে বিরক্তি কিম্বা হঠকারিতা ছিল না। তাঁহাকে এবং তাঁহার কার্য্য সকল, যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মুক্তকণ্ঠে বলিয়া থাকেন, যে, শরৎসুন্দরী, সকল কার্য্যেই অহঙ্কারশূন্যা হইয়া ঈশ্বরের প্রীতির নিমিত্ত, করিতেন। আর তিনি ঈশ্বরের নিয়োগ অনুসা-রেই সকল কার্য্যে প্রবৃত্তা, ইহাই তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস ছিল। এই

অল্পবয়সে তাঁহার মেধা এবং ধারণাশক্তি এত প্রখরা ছিল যে, অতি সমারোহ কার্য্যেও পর্য্যায় ভঙ্গ কিম্বা অঙ্গহীনতা ঘটিত না। তাঁহার বাল্য বয়সের প্রকাশোন্মুখ গুণাবলী, এখন বয়স ও কার্য্যপরিসর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল। তাঁহার স্বধর্ম্মে জীবন্ত বিশ্বাস, এবং বিশ্বপ্রেমিকতায় যোগেন্দ্রনারায়ণ, বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং এরূপ গুণবতী পত্নীর পতি বলিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাজা যোগেন্দ্র নারায়ণের বয়ঃপ্রাপ্তি, সম্পত্তি স্বহস্তে গ্রহণ, নীল বিদ্রোহ ও শরৎসুন্দরীর অকাল বৈধব্য।

রাজা যোগন্দ্রনারায়ণ ১২৬৬ বঙ্গাব্দের পৌষমাসে প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়া, ১২৬৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে স্বহস্তে সম্পত্তি শাসনের ভার গ্রহণ করেন। *

* ১২৪৭ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে যোগেন্দ্রনারায়ণের জন্ম হয়, সুতরাং ১২৬৫ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে তাঁহার পূর্ণ আঠার বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছিল। তৎকালের আইনে আঠার বৎসর বয়সই বয়ঃপ্রাপ্ত কাল নির্দ্দিষ্ট ছিল। সেস্থলে তাঁহার ১২৬৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে সম্পত্তি লাভ করিবার কারণ কি? তৎসম্বন্ধে তাঁহার সম্পত্তির তৎকালীয় মেনেজার শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার মজুমদার (যিনি এক্ষণে কলিকাতা মহামান্য হাইকোর্টে কতিপয় জমিদারের পক্ষে মোক্তারী করিয়া থাকেন) বলেন যে, যোগেন্দ্রনারায়ণের কোষ্ঠি দৃষ্টে, ১২৬৫ বঙ্গাব্দই তাঁহার প্রাপ্ত বয়স্ক কাল নির্ণীত হইয়া, রাজসাহীর কলেক্টর কর্ত্তৃক ঐ সময় পর্য্যন্ত সমস্ত সম্পত্তি ইজারা বিলি হইয়াছিল। পরে যোগেন্দ্রনারায়ণ যে সময়ে কলিকাতার শিক্ষাগারে প্রবেশ করেন, সে সময়ে ডাক্তার

কলিকাতার শিক্ষাগারে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি অল্পই হইয়াছিল। তাঁহার শিক্ষার অন্তরায় নানা কারণে ঘটিয়াছিল, তাহা যথা ক্রমে বিবৃত হইতেছে।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, যোগেন্দ্রনারায়ণের সম্পত্তি ওয়াটসন কোম্পানির মধ্যে ইজারা ছিল। ১২৫৯ বঙ্গাব্দ হইতে ১২৬৫ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত সাত বৎসর ইজারার মিয়াদ ছিল। ১২৬৫ বঙ্গাব্দে ইজারার সময় ফুরাইল, কিন্তু সম্পত্তি হইতে নীলকরের সংস্রব রহিত হইল না। মেয়াদ অতীত হইলেও, "নিজজোত" * নামে অনেকগুলি

রাজেন্দ্রলাল মিত্র বোর্ড অব রেভিনিউতে (Board of Revenue) রিপোর্ট করেন যে, যোগেন্দ্রনারায়ণের শারীরিক গঠন ও দন্তাদি দৃষ্টে প্রকৃত বয়ঃক্রম অপেক্ষা অধিক প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, এবং তাঁহার বিবেচনায় ১২৬৬ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে পূর্ণ বয়স্ক কাল অনুভব হয়; এবং ঐ কাল পর্য্যন্ত শিক্ষাগারে না থাকিলে, তাঁহার সুশিক্ষার ব্যাঘাত হইবে। বোর্ড অব রেভিনিউ হইতে রাজেন্দ্র বাবুর অনুমানই অকাট্য প্রমাণ রূপে গৃহীত হইয়া ১২৬৬ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসই বয়ঃ পূর্ণের কাল নির্ণীত হয়। রাজেন্দ্র বাবু এক জন বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ ছিলেন; এবং প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে আজীবন লেখনী চালনা করিতেও ক্রটি করেন নাই। যদি সমুদয় কার্য্যে এইরূপ অভিজ্ঞতা পরিচালনা করিয়া থাকেন, তবে বঙ্গদেশের বড়ই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন যে, রাজেন্দ্র বাবু, যোগেন্দ্রনারায়ণের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির চাতুর্য্যে জ্বালাতন হইয়া প্রস্তাবিত উপায়ে শাস্তি দিয়াছিলেন। কিন্তু যে গবর্ণমেণ্টের আইনে গুরুতর অপরাধের বন্দীকে নিয়মিত কালের অতিরিক্ত এক ঘণ্টা কাল কারাবদ্ধ রাখিলে গুরুতর অপরাধ হয়, সেই গবর্ণমেণ্টের প্রধানতম রাজস্ব কর্ম্মচারী, কোন প্রমাণের বলে কোষ্ঠী অগ্রাহ্য করিয়া, তাঁহাকে এক বৎসরের অধিক কাল, শিক্ষাগাররূপ কারাগারে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, তাহা জ্ঞান বুদ্ধির অতীত।

১২৬৬ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে পূর্ণ বয়স্কের কাল হইলেও, ভগ্ন বৎসরে হিসাব নিকাশের গোলোযোগ হয় বলিয়া, কালেক্টর চৈত্র মাস পর্য্যন্ত, যোগেন্দ্রনারায়ণের হস্তে সম্পত্তি দিয়াছিলেন না। এই কালেক্টর বিখ্যাত মিঃ টেলার, যোগেন্দ্রনারায়ণের রাজসাহী জেলার ইজারাদার ওয়াটসন কোম্পানীর বোয়ালিয়ার কুঠির কর্ম্মাধ্যক্ষ মিঃ কুবরন সাহেবের কন্যাকে বিবাহ করিয়া নীল বিদ্রোহের সময় অনেক সুকীর্ত্তি করিয়াছিলেন।

* নিজজোতের প্রকৃত ব্যবহারিক অর্থ, নিজের আবাদি ভূমি। কিন্তু কৃষকেরা, নীলকরদিগের সম্বন্ধে ইহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিত। তাহারা বলিত যে, প্রজার

ভূমি সাহেবেরা আপন দখলে রাখিয়াছিলেন; ইহা ভিন্ন "সাটার" * প্রভাবে লস্করপুরের অধিকাংশ প্রজা, নীল বপনের দৌরাত্ম্যে ঘোরতর প্রপীড়িত হইয়াছিল। লস্করপুর পরগণার অনেকগুলি গ্রাম পদ্মা, বড়াল ও গদাই নদীর উভয় তীরে সন্নিবিষ্ট, সুতরাং নীল উৎপন্নের উপযুক্ত চড়া ভূমিও বিস্তর; অত্রাবস্থায়, নীলকরদিগের লস্করপুরের লোভ ত্যাগ করা, বড়ই দুঃসাধ্য। যোগেন্দ্র নারায়ণ, কলিকাতায় শিক্ষাগারে গমন করিয়া অবধি প্রজাদিগের আর্ত্তনাদ শুনিতেন। কলেজ বন্ধের সময় তিনি স্বদেশে আসিলেই, প্রজারা দলে দলে তাঁহার নিকট আসিয়া নীলকরের দৌরাত্ম্যের বিষয় নানা অভিযোগ করিত। অপ্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া, তাঁহার কোনই ক্ষমতা নাই, অথচ দরিদ্র প্রজার কষ্টে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইত। তিনি একজন প্রতিভাশালী তেজস্বী মনুষ্য ছিলেন; সংসারে দুর্ব্বলের প্রতি বলবানের অত্যাচার কিম্বা কোন প্রকার প্রতারণাজালে কাহাকেও বিপদাপন্ন দেখিলে, তিনি ক্রোধে ও ঘৃণায় এককালে অস্থির হইতেন। অতএব ইংরেজ অধিকারের বহু পূর্ব্বের তাঁহার পুরুষানুক্রমিক ভোগের সম্পত্তির দরিদ্র কৃষক প্রজার কষ্টে তাঁহার হৃদয়ে কিরূপ তীব্র যাতনা হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়। অথচ তখন তাঁহার সেই সকল অনাথ কৃষকদিগের সাহায্য করিবার কোন শক্তিই ছিল না। তাঁহার সম্পত্তি

চতুর্দ্দশ পুরুষের ভোগের ভূমি, যদি, নীল উৎপন্নের যোগ্য হয়, তবে সেই ভূমি নীলকরদিগের "নিজজোত" এবং তাহার অন্য লিখিত দলিল না থাকিলেও, নীল বৃক্ষের মূল, ও নীলের চারাই আদালত গ্রাহ্য অমোঘ দলীল।

* প্রজা, আপনার জোতের ভূমিতে নীল আবাদ নিমিত্ত যে, অগ্রিম দাদন গ্রহণ করে, তাহার এগ্রিমেণ্ট সাট্টানামে অভিহিত। "সাট্টা" পারিভাষিকে কুযুক্তিতে দলবদ্ধ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা "উহারা এক সাট্টা (এক পরামর্শে দলবদ্ধ) হইয়া এই কুকার্য্য করিল।"

থাকিলেও তাহা, পরের হস্তগত; এবং যে কালেক্টর তাঁহার ও তাঁহার প্রজাগণের রক্ষক, তিনি, নীলকরের প্রধান কর্ম্মচারীর জামাতা। তজ্জন্য তিনি, আপনার অপ্রাপ্তবয়স্ককালকে সহজেই সুদীর্ঘ দেখিতেন; তাহার পর, আবার অন্যের ক্ষমতা বলে সেই কাল অবৈধরূপে দুই বৎসর বাড়িয়া গেল। যোগেন্দ্র নারায়ণ, এইরূপে ক্ষমতাশালীর অসঙ্গত অত্যাচারে আত্মহারা হইয়াছিলেন। তাঁহার এ দুঃখ,—হৃদয়ের এ জ্বালা সামান্য নহে, সুতরাং শিক্ষাগারের শিক্ষাসংক্রান্ত বল-প্রয়োগে তিনি, ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। রাজেন্দ্র বাবু তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য নানা উপায় করিতেন, এবং তাঁহার স্বাধীনতা সংযত করিতেও ত্রুটী করিতেন না। সে সময়ে যোগেন্দ্রনারায়ণের বয়স প্রায় সতের বৎসর, অতএব তিনি, স্বেচ্ছাচারী তত্ত্বাবধায়কের ছন্দোনুবর্ত্তী না হইয়া, বরং সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিতেন। এরূপ স্থলে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। তিনি, নিয়তকাল অন্যমনস্ক থাকিয়া আপনার প্রাপ্তবয়স্ক কাল মাত্র গণনা করিতেন। সে সময়ে কতকগুলি চরিত্রহীন লোক তাঁহার সঙ্গী হইয়া সর্ব্বদা কেবল কুপরামর্শ প্রদান করিত। যোগেন্দ্রনারায়ণ, হৃদয়ের দুর্দ্দম জ্বালা নিবারণ জন্য অবশেষে সেই সঙ্গীদিগের সাহায্যে সুরার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য, প্রজা, যাহার উপরই কেন না হউক; কঠোর শাসন প্রযুক্ত হইলে অধিকাংশ স্থলেই প্রায় বিষময় ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। বৃটিশ কারাগারে বন্দীদিগের তামাক খাইবার জন্য প্রত্যহ কঠোর দণ্ড হইলেও, কারাগার মাত্রেই সেই কঠোর শাসনের মধ্যে শত শত সের তামাক পুড়িয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় যোগেন্দ্রনারায়ণের মত তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী ধনী সন্তানের ইচ্ছা পূরণে বাধা দিতে রাজেন্দ্র বাবুর পক্ষে সম্পূর্ণ অসাধ্য। অতএব

যোগেন্দ্রনারায়ণ, শিক্ষাগার হইতে বিদ্যার পরিবর্ত্তে সুরাকে সঙ্গে লইয়া যদিচ ভগ্ন হৃদয়ে আসিয়াছিলেন, তথাপি, তাঁহার পরদুঃখকাতরতা, ন্যায়পরতা ও কঠোর অধ্যবসায়শীলতার উন্নতি ব্যতীত অবনতি হয় নাই।

যোগেন্দ্রনারায়ণ, সম্পত্তির কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই, ভীষণ কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। নীলকরদিগের অত্যাচার দমনই তাঁহার প্রথম ও প্রধানতম কার্য্য হইল।* তাঁহার নিকটে দলে দলে প্রজা আসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে নীলকরের ভয়ঙ্কর অত্যাচার কাহিনী কহিয়া আশ্রয় ভিক্ষা চাহিতে লাগিল। তিনি প্রথমে মিষ্ট কথায় কুঠির কর্ম্মচারীদিগকে সৎপথে ব্যবসায় চালনার জন্য উপদেশ করিলেন; কিন্তু, কেহই সে কথায় কর্ণপাত করিল না। বরং তাহারা, যোগেন্দ্রনারায়ণকে প্রচুর অর্থের প্রলোভন দিয়া পুনরায় ইজারার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু, যোগেন্দ্রনারায়ণ, সেরূপ অপরিণামদর্শী অর্থপিশাচ ছিলেন না, তিনি ঘৃণার সহিত ইজারার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। অবশেষে তিনি দেখিলেন, যে, তাঁহার সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ, সাহেব-

* এই সময়ে বঙ্গদেশে নীলকরের অত্যাচার শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল, বলিয়া ধ্বংস কালও আসন্ন হইয়াছিল। সে সময়ে দেশময় কিরূপ কালানল জ্বলিয়াছিল, তাহা নীল বিদ্রোহের ইতিহাস পাঠ করিলেই জানা যায়। এখনও তাহার প্রত্যক্ষ দর্শী ভুক্তভোগী অনেকেই জীবিত আছেন। তাঁহাদিগের মুখে অত্যাচারের বিবরণ শুনিতে আরম্ভ করিলে নৃসংশতার প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি সিরাজউদ্দৌলাকে দেবতার আসন দিতে ইচ্ছা হয়। কুঠিয়ালগণ, স্বাধীন অবাধ বাণিজ্যের দায় দিয়া প্রবল প্রতাপ ন্যায় পরায়ণ বৃটিশ সিংহের সম্মুখে কিরূপ ভীষণতম নৃশংসতা, কিরূপ যথেচ্ছাচার করিয়াছিলেন, তাহার সামান্য মাত্র চিত্র, মহাত্মা দীনবন্ধু মিত্র, "নীল-দর্পণে" দেখাইয়াছেন। পাদরী, মহাত্মা লং সাহেব, তাহার ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া বৃটিশ আইনের সর্ব্বশক্তিমত্তায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। হিন্দু পেট্রিয়টের উদ্যমশীল যুবক সম্পাদক মহাত্মা হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় পেট্রিয়টের মুখে নীলকরের দৌরাত্ম্য বর্ণন করিয়া কঠোর পরিশ্রমে, নানা দুশ্চিন্তায় জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

দিগের "নিজজোত" নামে হস্তচ্যুত হইয়াছে। অতএব ঐ সকল ভূমি প্রত্যর্পণ জন্য তিনি বারম্বার সাহেবদিগের নিকট প্রস্তাব করিতে লাগিলেন, কিন্তু, তাহা হইলে নীলকরের নীল আবাদ উঠিয়া যায়।—তাঁহাদের অবাধ বাণিজ্যে বাধা পড়ে। তাঁহারা রাজার জাতি, যোগেন্দ্রনারায়ণের মত সামান্য জমিদারের কথা শুনিবেন কেন? নীলকরেরা সাধুতা অবলম্বন করিলে, বাঙ্গালার নিরীহ দরিদ্র প্রজাকুল প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া দলবদ্ধ হইত না। নীলকরের পাপ চতুষ্পাদপূর্ণ হইয়াছিল বলিয়াই, শান্ত প্রজাগণ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, প্রবল বিদ্রোহানল জ্বালিয়াছিল। এই সময়ে সহস্র সহস্র প্রজা, শত শত উদ্যমশীল, যুবক, সেই অনলে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। বঙ্গদেশে এই সময়ে শত শত সতীর সতীত্ব নাশ, সহস্র সহস্র প্রজা কারাগার নিক্ষিপ্ত, সহস্র সহস্র দরিদ্রের কুটীর ছারক্ষার হইয়া, শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। কত শত নির্ম্মল চরিত্রের যুবক, সংসারে প্রবেশ করিয়া চিত্তের সমস্ত শান্তি,—সংসার সুখের নানা প্রকার মোহিনী কল্পনা এবং সমস্ত আশা ভরসা বিসর্জ্জন দিয়া অকুতোভয়ে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিল, তাহা মনে করিতেও হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হয়।

কুমার যোগেন্দ্রনারায়ণও, তাহাদিগের মধ্যে একজন। তিনি এই অত্যাচার দমনে প্রস্তাবিত সাধুতা করিয়াও যখন বিফলমনোরথ হইলেন, তখন, তাঁহার হৃদয়ে ঘোর অশান্তি উপস্থিত হইল। পুনঃ পুনঃ পতনে তাঁহার আত্মবিস্মৃতি জন্মিল। রাজদ্বারেও ইহার প্রতিকারের উপায় এক প্রকার রুদ্ধ হইয়াছিল। সে সময়ে অনেক মাজিষ্ট্রেটই নীলকরদিগকে প্রশ্রয় দিয়াছিলেন, বিশেষতঃ রাজসাহীর মাজিষ্ট্রেট মিঃ টেলারের বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যোগেন্দ্রনারায়ণ বারম্বার উদ্যমভঙ্গে ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন, শরীর ও

সম্পত্তি বিসর্জ্জন দিয়াও নীলকরের হস্ত হইতে নিরীহ প্রজাকুলকে উদ্ধার করিবেন। সে সময়ে এই দুশ্চিন্তায় তাঁহার আহার নিদ্রা দূরের কথা, পবিত্রহৃদয়া প্রণয়িনী শরৎসুন্দরীও তাঁহার হৃদয় হইতে স্থানচ্যুতা হইলেন।

নানা বিপদের দুশ্চিন্তায়, যোগেন্দ্রনারায়ণের অন্তঃকরণে ক্ষণ-কালও অবকাশ ছিল না। তিনি সুপবিত্র ছাত্র-জীবনেই, সংসারের নানা, উপদ্রবে জর্জ্জরীভূত হইয়াছিলেন, তথাপি ভরসা ছিল, যে, স্বাধীন হইয়া সাধ্যমত চেষ্টায়, এই উপদ্রবের প্রতীকার করিবেন; কিন্তু এখন দেখিলেন, আপনার জীবন দিলেও নীলকরের অত্যাচার দমনের সম্ভাবনা নাই। অতএব সেই পৈশাচিক উপদ্রবে,—কুচক্রীর ভীষণ নৃসংশ চক্রে পড়িয়া তাঁহার জীবনের সকল সুখ শান্তি,—সংসা-রের সকল সাধ বিসর্জ্জন দিতে হইল। তিনি যেরূপ কার্য্যে ব্রতী হইলেন, তাহাতে তাঁহার স্নান, আহার নিদ্রার পর্য্যন্ত সময় স্থির থাকিত না। এমন কি, কোন কোন দিন আহারে বসিয়া গুরুতর কার্য্য জন্য মুখের গ্রাস ত্যাগ করিয়া উঠিতে হইয়াছে। প্রায়শঃই, দুই তিন ঘণ্টার অধিক নিদ্রা যাইতে পারিতেন না। সুতরাং স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া তিলে তিলে তাঁহার যৌবজীবন যে ধ্বংসের অভিমুখী হইতে লাগিল, তাহা তিনি, বুঝিয়াও বুঝিলেন না। তাঁহার হৃদয়, প্রদীপ্ত তেজে—দুর্দ্দম উৎসাহে পরিপূর্ণ; তিনি এই কার্য্যে আপনার সমস্ত সম্পত্তি,—সমস্ত অর্থ, এমন কি, প্রাণ পর্য্যন্তও দিবেন বলিয়া শপথ করিয়াছেন, অতএব প্রাণের প্রতি অনুমাত্রও মমতা রহিল না। প্রথমে রাজার শাসন-বলের প্রতি যে কিছু আস্থা ছিল, রাজকর্ম্মচারী-দিগের স্বজাতি বাৎসল্য দেখিয়া, তাহাও লয়প্রাপ্ত হইল। অবিচারে,—পুনঃ পুনঃ উদ্যমভঙ্গে,—বারম্বার প্রতিজ্ঞার দুর্দ্দম বেগে বাধা পাইয়াও

তিনি সঙ্কল্প ভঙ্গ করিলেন না। শরীর যতই ক্ষয় পাইতে লাগিল, উৎসাহও ততই বাড়িতে লাগিল। অবশেষে আপনার সমস্ত ভবিতব্য বিস্মৃত হইয়া নীলকরের বিরুদ্ধে দরিদ্র প্রজাদিগকে বাহুবল আশ্রয় জন্য উৎসাহিত করিলেন। তাঁহার এই মহাপুণ্য কার্য্য,—এই সর্ব্বস্ব ত্যাগ প্রতিজ্ঞা জানিতে পাইয়া অন্যের অধিকারস্থ সহস্র সহস্র দরিদ্র প্রজা আসিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিল। তিনি পরম আহ্লাদে আত্মপর নির্ব্বিশেষে সকলেরই পৃষ্ঠপোষক হইলেন। অতি অল্প দিনের মধ্যে সহস্র সহস্র লাঠীয়াল, প্রজাদিগের স্বার্থ রক্ষার জন্য নিযুক্ত হইল। নীলকরদিগেরও বলসংগ্রহে ক্রটি ছিল না। কিন্তু, গ্রামে গ্রামে সমস্ত প্রজা দলবদ্ধ, সকলেই জীবনের শেষ উদ্যমে ক্ষিপ্ত হইল, তখন কুঠীয়ালদিগের মুষ্টিমেয় ঠিকা লাটীয়ালে আর কি করিতে পারে? যখন, দেশব্যাপী অনলের নির্ব্বাণ করা নীলকরদিগের অসাধ্য হইল, তখন, অনেক স্বদেশ প্রেমিক রাজকর্ম্মচারী, সুবিচার বলে দলে দলে প্রজাদিগকে কারাগারে দিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু, কিছুতেই কিছু হইল না। নিরীহ প্রজারাও উত্তরোত্তর সংকল্প সাধনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইতে লাগিল। সে সময়ে কোন কোন রাজকর্ম্মচারীর চৈতন্য হইল। কেহ কেহ তখন পর্য্যন্তও আপনার কর্ত্তব্যে দোষ দেখিতে পাইলেন না। রাজসাহীর কুঠীয়াল-বন্ধু মাজিষ্ট্রেট মিঃ টেলার শেষোক্ত শ্রেণীর লোক ছিলেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহার হাতে কোর্ট মার্শেলের ক্ষমতা দিয়াছিলেন না; সেরূপ ক্ষমতা থাকিলে গাছে গাছে নিরীহ প্রজা দোদুল্যমান হইত কি না, কে বলিতে পারে।

যোগেন্দ্রনারায়ণ ধর্ম্মবলে জয়লাভ করিলেন। চন্দ্রকলা প্রভৃতি স্থানের নীলকুঠী কয়েকটী অতি অল্পদিনের মধ্যে জনশূন্য হইল। নীল-

করদিগের গুদামরূপ কারাগারে কৃষকদিগের আর্ত্তনাদ বন্ধ হইল।—প্রজারা, যে পরোপকারী যোগেন্দ্রনারায়ণের আশ্রয় লইয়া প্রাণ পণ চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা সফল হইল। *

যোগেন্দ্রনারায়ণ, ১২৬৭ বঙ্গাব্দে সম্পত্তির ভার গ্রহণ অন্তে, ১২৬৮ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত, নীল বিদ্রোহে আত্মসমর্পণ করিয়া বহুকষ্টে যেমন কৃতকার্য্য হইলেন; সেইরূপ দিনে দিনে তিনি আপনিও মৃত্যুপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শরীর, নানা রোগে আক্রান্ত হইলেও অভ্যাস বশে প্রাণঘাতিনী সুরাকে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম এবং দুর্দ্দম উৎসাহ দেখিয়া তাঁহার আত্মীয়গণও প্রথমে তাহা বুঝিয়াছিলেন না। তাঁহার অসাধারণ দৃঢ়তা, অবিচলিত কর্ত্তব্য নিষ্ঠা, নির্ভীক স্বদেশ প্রেমিকতা, এবং প্রকৃত আত্মত্যাগ সমন্বিত মহত্বজনক প্রজা বাৎসল্য, এই হতভাগ্য নির্জীব দেশে অনেকেরই শিক্ষণীয়। তিনি, প্রস্তাবিত শক্তিবলে নীলকরদিগের "নিজ জোত" নামক বিস্তর ভূমি আপনার করায়ত্ব করিয়া পূর্ব্বাধিকারী প্রজাকে দিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্যমশীলতায় সাটার উপদ্রবও, অনেক পরিমাণে কমিয়াছিল; ফলতঃ মৃত্যু যদি

* প্রস্তাবিত বিদ্রোহের মধ্যে যোগেন্দ্রনারায়ণের প্রাণপণ উৎসাহে উচ্ছৃঙ্খল প্রজারা কতিপয় কুঠী লুণ্ঠন করিয়াছিল। নীলের বীজে পুঠিয়ার শ্যামসাগর নামক দীঘির জল এরূপ বিবর্ণ ও দুর্গন্ধ হইয়াছিল, যে, তাহার নিকট দিয়া গমনাগমন অসাধ্য হইয়াছিল। নীলকরগণ, প্রাণ ভয়ে মিঃ টেলারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। শেষে তিনি, মহাভীত হইয়া গবর্ণমেণ্টে লিখিয়া একদল অস্ত্রধারী সৈন্য আনাইয়াছিলেন। প্রত্যেক বিপদাপন্ন কুঠী রক্ষার জন্য সেই সকল সৈন্য নিযুক্ত হইল। মিঃ টেলারের নিকট উভয় পক্ষ হইতে শত শত মোকদ্দমা উপস্থিত হইতে লাগিল। তখন তাঁহাকে প্রায় চারি মাস কাল ঘটনা স্থানসকলে ভ্রমণ করিয়া বিচার নিষ্পত্তি করিতে হইয়াছিল। বিচারে যে, দলে দলে প্রজা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা আর বলিবার প্রয়োজন রাখে না।

আর কিছু দিন তাঁহাকে অবসর প্রদান করিত, তাহা হইলে তাঁহার অধিকারে আর নীলের ক্ষেত্র দেখা যাইত কিনা সন্দেহ। কিন্তু সেই ইচ্ছাময় ভগবানের কার্য্যের উদ্দেশ্য, মানববুদ্ধির অতীত। অতি অল্পদিনের মধ্যেই যোগেন্দ্রনারায়ণের আত্মীয়গণ, বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার কার্য্যতৎপরতা, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্তও সমান-ভাবে থাকিবে। অতএব তাঁহার কার্য্য কিম্বা উদ্যমশীলতা শারিরীক স্বাস্থ্যের পরিচায়ক নহে। তখন সকলেই তাঁহার সুচিকিৎসার জন্য বিশেষ চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। নীলবিদ্রোহে ইংরেজ জাতির প্রতি, তাঁহার ঘোরতর অশ্রদ্ধা হইয়াছিল। তজ্জন্য তিনি, ডাক্তারি চিকিৎসার কথা শুনিতে পারিতেন না। বাস্তবিক পক্ষে তাহা যে তাঁহার সম্পূর্ণ ভ্রান্তিপূর্ণ বিশ্বাস, ইহা তিনি, প্রথমে বুঝিতে পারিয়াছিলেন না। ইংরেজ জাতির মধ্যে দেবস্বভাবাপন্ন ব্যক্তিরও অভাব নাই। দুই চারিজন বিচারক কিম্বা কতকগুলি বণিক ইংরেজের চরিত্র দেখিয়া ইংরেজ জাতিমাত্রকে দোষ দিতে পারা যায় না। সমস্ত ইংরেজ জাতির হৃদয়ে জাতীয় উন্নতির মহান্ বীজ রোপিত থাকিলেও সকলেই তাহাতে অসদুপায় প্রয়োগ করেন না। তাহা করিলে আটাইশ কোটী লোক-নিবাস ভারতবর্ষ, মুষ্টিমেয় ইংরেজের রক্ষণাধীনে নিরাপদে থাকিতে পারিত না। ইংরেজ জাতির ন্যায়পরতা, সার্ব্বজনীন না হইলেও, অনেক সভ্য জাতিরও অনুকরণীয়।

যাহাহউক, যোগেন্দ্রনারায়ণ, প্রথমে ডাক্তারিমতে চিকিৎসায় অসম্মত থাকিলেও, যখন এককালে শয্যাগত হইলেন, তখন আত্মীয়-দিগের কথায় রামপুর বোয়ালিয়ায় গিয়া ডাক্তার সাহেবের চিকিৎসাধীন হইলেন। সে সময়ে বালিকা শরৎসুন্দরীকে তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য কেহই চেষ্টা করেন নাই। ত্রয়োদশ বৎসরের কুলবধূর পক্ষে এরূপ

স্বাধীনতা নাই যে, তিনি স্বেচ্ছা প্রবৃত্তে তাহার কোন প্রতিবিধান করিতে পারেন। অতএব তৎকালে কেবল নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া মনোদুঃখ মনেই দমন করিয়া রাখিলেন। অল্প দিন মধ্যে বোয়ালিয়া নগরেই যোগেন্দ্রনারায়ণের আয়ুঃশেষ হইল। যোগেন্দ্র নারায়ণ জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত যে কিরূপ স্বাধীনচেতা কর্ত্তব্য পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন, তাহার একটী দৃষ্টান্ত দিয়াই এ অধ্যায় শেষ করা যাইতেছে।

বোয়ালিয়ায় একদিন তাঁহায় একটী বাল্যসখা, তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন, যোগেন্দ্রনারায়ণ সে সময়ে জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, অরুচি, এবং অজীর্ণ প্রভৃতি নানা পীড়ায় আক্রান্ত। তাঁহার স্ববশে উঠিবার শক্তি ছিল না। তিনি জীবনে এককালে হতাশ হইয়া মৃত্যুশয্যাশায়ী হইয়াছিলেন। বাল্যসুহৃদ্‌কে দেখিয়া যোগেন্দ্রনারায়ণ মৃদুস্বরে কাতর-ভাবে তাঁহার নিকট এ জন্মের শোধ বিদায় চাহিলেও, তাঁহার বন্ধু প্রথমে কোন উত্তর দিতে না পারিয়া অনর্গল অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। বন্ধুর বিশ্বাস যে, এখনও নীলকরের সহিত সন্ধি হইলে রাজার মানসিক ক্লেশ নিবারণ হইয়া দারুণ রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। সেই জন্য তিনি অত্যন্ত সন্তপ্ত হৃদয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—

"নীলকরদিগের সঙ্গে এখনও সন্ধি করিলে তোমার দুশ্চিন্তা লাঘব হইতে পারে। মানসিক চিন্তাই এই ব্যাধির মূল। সেই চিন্তা দমন হইলে অল্প দিনেই শরীরও আরোগ্য হইতে পারে। ভাই! সংসারে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম কিছুই নহে!"

যোগেন্দ্রনারায়ণ তখন একখানি মোটা কাপড়ে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া শয়ান ছিলেন। বন্ধুর মুখে উল্লিখিত শব্দ কয়েকটী নির্গত

হইবা মাত্র, মুমূর্ষ সিংহ, ব্যাধির সেই অসহ্য যাতনা এবং মৃত্যুর বিভীষিকা বিস্মৃত হইলেন। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও মহত্বের প্রতিভায় সেই দুর্ব্বল শরীরে যেন, মত্তহস্তীর বল সঞ্চয় হইল। তিনি সবলে গাত্রাবরণ খানি দূরে নিক্ষেপ করিয়া অকস্মাৎ উঠিয়া বসিলেন। অস্থি চর্ম্মাবশেষ দেহের শিরায় শিরায় অতি তীব্রবেগে রক্তস্রোত বহিতে লাগিল। নিস্তেজ চক্ষু, বিকট ঘৃণাব্যঞ্জকতেজে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অবশেষে তিনি বন্ধুর হাত দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন—

"ভাই! তুমিত এই কথা বলিতেছ? তুমি বন্ধু হইয়া আমার আসন্ন কালে কাপুরুষের মত উপদেশ দিয়া আমার মুমূর্ষ হৃদয়ে বিষম আঘাত প্রদান করিলে। যোগেন্দ্রনারায়ণ মৃত্যুভয়ে অত্যাচারীর পদানত হইবে, একথা মনেও স্থান দিও না। যে মুহূর্ত্তে আমার প্রাণের অংশ স্বরূপ প্রজার দুর্দ্দশা দেখিয়াছি, সেই মুহূর্ত্তেই শপথ করিয়াছি যে, দেশ হইতে নীলের দৌরাত্ম্য দূর করিব। নিজের জীবন এবং পৈতৃক সমস্ত সম্পত্তি এই সৎকার্য্যে অতি সন্তোষের সহিত বিসর্জ্জন দিব। সেই প্রতিজ্ঞাপালন করিতেই আমার এই চরম দশা উপস্থিত। তথাপি এ মরণে যে আমার কত সুখ, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। কেননা আমার পৈতৃক ভূমিতে নীলের আবাদ প্রায় বন্ধ হইয়াছে; কুঠীর ভীষণ যাতনাদায়ক কারাগার শূন্য হইয়াছে। নিরক্ষর দুর্ব্বল প্রজারা অত্যাচারীর অত্যাচার নিবারণের পথ দেখিতে পাইয়াছে। ইহা অপেক্ষা আমার জীবনে শান্তি, হৃদয়ে কৃতকার্য্যতার আনন্দ আর কি হইতে পারে। ইহার পরও যদি জীবিত থাকি, তবে এই ব্রতেই জীবন অতিবাহিত করিব। এই কার্য্যে সমস্ত সম্পত্তি যায়, তাহাতেও আমার বিন্দুমাত্র কষ্ট নাই। আমি ব্রাহ্মণের সন্তান, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিব। তথাপি পৈতৃক সম্পত্তির এক বিন্দু ভূমি

থাকিতে,—আমার দেহে জীবন থাকিতে এই মহৎ ব্রত ত্যাগ করিব না। তুমি জান, ইংরেজ অধিকারের অনেক পূর্ব্ব হইতে আমার পুরুষানুক্রমিক স্বত্বভোগের পৈতৃক সম্পত্তি, পৈতৃক বাস্তুভূমি। আমি সেই বাস্তুভূমিতে জন্মিয়া, এই সমস্ত নিরীহ প্রজার প্রদত্ত রক্তের অংশে পরম সুখে পালিত হইয়াছি। প্রজারা আমার প্রাণাপেক্ষা সহোদর ভ্রাতা। পবিত্র জন্মভূমিতে, সেই পবিত্র বাস্তুতে, যে বিদেশীয়েরা বাণিজ্যের ছলে প্রবেশ করিয়া অমানুষিক অত্যাচার করিতেছে, তাহাদিগেরই সহিত বন্ধুভাবে সন্ধি করিব? আমার এ ছার জীবনে ধিক্! এমন কলঙ্কিত জীবন আমি এক নিমিষের জন্যও চাহি না।” এই কথা বলিতে বলিতে অভিমানে, ক্রোধে, ঘৃণায়, তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল।—নিস্তেজ, নীরক্ত চক্ষু হইতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার প্রখর জ্যোতি নির্গত হইতে লাগিল। সেই সঙ্গে প্রবল রোগ জ্বর আসিল। তিনি শেষে আসন্ন শরীরে পুনরায় শয্যায় পতিত হইলেন। তাঁহার বাল্য সখা ঘোর অপ্রতিভ হইয়া ক্ষমা চাহিলেন, কিন্তু যোগেন্দ্রনারায়ণ আর কথা কহিতে পারিলেন না। তাঁহার সেই কাল জ্বর আর ত্যাগ হইল না। ইহার দুই কি এক দিন পরেই তাঁহার আসন্নকাল উপস্থিত হইল। তিনি সকল আশা, সকল ভরসা, সকল দুঃখ, সকল সন্তাপ লইয়া যৌবনের প্রথম উদ্যমে অতৃপ্ত জীবনে, ১২৬৯ বঙ্গাব্দের ২৯শে, বৈশাখ তারিখে একুশ বৎসর এগার মাস বয়সে ইহধাম ত্যাগ করিলেন। সে সময়ে বোয়ালিয়ায় কর্ম্মচারী ও সাধারণ ভৃত্য ব্যতীত তাঁহার মৃত্যুকালে আত্মীয় বলিতে আর কেহই ছিল না। তিনি আপনার আসন্নকাল জানিয়া পূর্ব্বেই এক খানি উইলের খসড়া প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন, জ্বরের প্রবল প্রাদুর্ভাবের সময় তাহা ছাপা করাইলেন। সাক্ষিদিগের সাক্ষাতে তাহাতে স্বাক্ষর করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু

ইংরেজী ভাষায় J পর্য্যন্ত লিখিতেই হস্ত হইতে লেখনীচ্যুত হইল, আর লিখিতে পারিলেন না। উইলে বালিকা শরৎসুন্দরীর হাতে সমস্ত সম্পত্তি অর্পণ করিয়াছিলেন।



চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বৈধব্য অন্তে চরিত্র, সম্পত্তির ভারগ্রহণ, দত্তক গ্রহণ, রাণী ও মহারাণী উপাধি লাভ দানাদি সৎকার্য্য এবং সংবাদপত্র ও গ্রন্থকারের সমালোচনা।

শরৎসুন্দরী, প্রাণাধিক পতির মৃত্যুশয্যায় তাঁহার কোন শুশ্রূষা করিতে পারিলেন না, বলিয়া আজীবন পরিতাপ করিয়াছিলেন। ফলতঃ যোগেন্দ্রনারায়ণের পরলোক গমনের সংবাদ পাইয়া অবধি শরৎসুন্দরীর হৃদয়ে অকাম ধর্ম্মের জ্যোতিঃ বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। তিনি বাল্যকাল হইতেই অসার সাংসারিক সুখে স্পৃহা হীনা ছিলেন। তবে তাঁহার চিত্তে সংসারের অনেক কর্ত্তব্য কার্য্যের সঙ্কল্প প্রবল হইয়াছিল। পরম দেবতা স্বামীর সাহায্যে তাহা ধীরে ধীরে সম্পাদনের অভিলাষ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভীষণ নীলবিদ্রোহে যোগেন্দ্রনারায়ণ আত্মসমর্পণ করায় সুশীলা পত্নীর সহিত সাক্ষাতের অবসর অল্পই পাইতেন। অতএব শরৎসুন্দরীর মনের সঙ্কল্প মনেই রহিয়া গেল। অনেকে বলিতে পারেন, শরৎসুন্দরী চরিত্রগুণে মহিলা কুলের শিরোমণি হইলেও, পতিকে সেই বিপদকালে সৎপথে আনিতে চেষ্টা না করিয়া ভাল করেন নাই। ইহার যথেষ্ট হেতুবাদ থাকিলেও,

তিনি সেই বালিকা বয়সে নিজে তাহার এক প্রকার উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা পরে বলা যাইতেছে। এখন তাঁহার প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ গুণগুলি জানিলে তাঁহার কথার অর্থ পরিগ্রহে সুবিধা হইতে পারে বলিয়া তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বে রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ একবার কলিকাতা আসিয়াছিলেন। যোগেন্দ্রনারায়ণ যদিও পূর্ব্বে একাকী আসিয়াছিলেন; কিন্তু কিছু দিন পরে তিনি, শরৎসুন্দরীকেও কলিকাতায় আনাইলেন। এখন শরৎসুন্দরীর বয়স ত্রয়োদশ বৎসর। অথচ তিনি বাল্যকাল হইতে প্রাক্তন সংস্কারে যে অকাম ধর্ম্মের বীজ পাইয়াছিলেন, তাহা এখন বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। তিনি কোন দিন আপনার সুখের জন্য,—আপনার স্বার্থের জন্য অন্যের ইচ্ছা কিম্বা স্বাধীনতায় বাধা দিতেন না। তাঁহার আপনার সহস্র অনিষ্ট হইলেও অন্যের হৃদয়ে আঘাত লাগিতে পারে, কার্য্যে কিম্বা কথায় তাঁহার সেরূপ অসাবধানতা কেহ কোন দিন দেখিয়াছিলেন এরূপ বলিতে পারেন না।

জীবমাত্রেরই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে বলিয়া জীব-জগতের এত উন্নতি। পক্ষান্তরে আবার, পরস্পরের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় যতদূর সাধ্য আঘাত না করিয়া, স্ব স্ব কর্ত্তব্য পরিচালনা করাই জীবের অপার মহত্ব। জীবকুলে মনুষ্য সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ এবং স্বাধীন হইয়াও পরক্ষে সর্ব্ব প্রকারে সমাজের অধীন। যে ব্যক্তি আপনার স্বাধীন ইচ্ছার বেগে অকারণে অন্যের স্বাধীনতায় আঘাত করেন, তিনি মনুষ্য হইয়াও পশুর অধম। অতএব মনুষ্য মাত্রেরই স্ব স্ব স্বাধীনতা পরিচালনায় একটি আপেক্ষিক সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহা বুঝিয়া সমাজ কিম্বা কাহারও ব্যক্তিগত আপেক্ষিক স্বাধীনতায় আঘাত

না পায় এরূপ ভাবে সুপথে স্বাধীনতা চালনা করিতে সকলেই অধিকারী। পরস্পরের স্বাধীন ইচ্ছার সীমা রক্ষার জন্যই মনুষ্য-দিগের মধ্যে সমাজ এবং রাজশক্তির প্রয়োজন। ফলতঃ যে স্থানে সমাজ ও রাজশক্তির সামঞ্জস্য আছে, সে স্থানের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সহজেই ঘটিয়া থাকে। আর যেখানে প্রস্তাবিত দুই শক্তির স্বার্থ-বিরোধ ঘটে, সে স্থানে আত্ম বলানুসারে সমাজ অথবা রাজশক্তি উভয়ের মধ্যে অচিরাৎ একের ধ্বংস দশা উপস্থিত হয়। অতএব সংসারে থাকিয়াও যিনি স্বার্থের জন্য কোন কার্য্যেই অন্যের হৃদয়ে আঘাত না করেন,—অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করেন, তিনিই প্রকৃত মহাত্মা। জ্ঞানী সংসারীরা প্রস্তাবিত সীমার মধ্যে থাকিয়া পরস্পর বিরোধী জ্ঞানযোগ এবং কর্ম্মযোগের সামঞ্জস্য সম্পাদন পূর্ব্বক জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন। সংসারী, এই মন্ত্রসাধন করিতে পারিলে মনুষ্য সাধারণকে এমন কি চরাচর জগৎকে আপনার বশে আনিতে পারেন। আর যোগীরা সংসারে থাকিয়া জ্ঞান ও কর্ম্ম যোগের সামঞ্জস্য দুস্কর বিবেচনায় সংসার ত্যাগ করিয়া থাকেন। শরৎসুন্দরী, বাল্যকাল হইতেই মূল প্রকৃতির প্রসাদে বিনা যোগে ইন্দ্রিয় বশীভূত, এবং সংসারে থাকিয়াও, অন্যের মনে ব্যথা না দিয়া—অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করিয়া সংসারের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তাঁহার কপালে দাম্পত্য সুখ অল্পই ছিল। সুতরাং আপনার অদৃষ্ট নির্ভর করিয়া, অবিচলিত চিত্তে সকল কষ্টই সহ্য করিয়াছেন। তিনি, যৌবসন্ধি কালে বিধবা হইয়াও, পতি দেবতা, কিরূপ প্রেম ও ভক্তির পাত্র, তাহা উত্তমরূপে বুঝিয়া-ছিলেন। পতি বিদ্যমানে কোনও দিন তাঁহার নিকট প্রগল্ভতা কিম্বা চপলতা প্রকাশ করেন নাই। যোগেন্দ্রনারায়ণকে তিনি, বাস্তবিকই

সাক্ষাৎ দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। দাম্পত্য সুখের অতৃপ্তি এবং অকাল বৈধব্যে তাঁহার হৃদয়ে পতিভক্তি, ব্রহ্মচর্য্য এবং অকাম ধর্ম্ম, দৃঢ়রূপে আশ্রয় করিয়াছিল। তিনি সধবা কিম্বা বিধবা হইয়াও কোনও দিনই পতিদেবতার কোনও দোষ দেখিতে পান নাই। অথচ পদে পদে আপনার নগণ্য দোষও দেখিতে পাইতেন।

কলিকাতায় অবস্থিতি কালে যোগেন্দ্রনারায়ণের অত্যাহিত দেখিয়া একজন হিতৈষিণী পরিচারিকা, শরৎসুন্দরীকে বলিয়াছিল, যে, তাঁহার মস্তকের উপর যখন শাশুড়ী প্রভৃতি কেহ গৃহিণী নাই, তখন আপনার ভাল মন্দ, আপনাকেই দেখিতে হয়। অতএব স্বামীকে এখন সদুপদেশ দিয়া আপনার বশে আনা কর্ত্তব্য। আর সেরূপ করিলে তাঁহার লোক নিন্দার ভয় কিছুই নাই। শরৎসুন্দরী, তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন যে—"তিনি আমার সর্ব্বময় কর্ত্তা,—পরমগুরু, আমার সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য তিনি আপনিই করিবেন। তাঁহাকে বুঝাইয়া বলি, কিম্বা তাঁহার কার্য্যের দোষ দেখাই, আমার এরূপ শক্তি নাই। তিনি যদি আমার প্রতি অপ্রসন্ন থাকেন, তবে তাহাতে তাঁহার কিছুই দোষ নাই; বরং আমি বুঝিব, যে, আমি তাঁহার অনুগ্রহ লাভের যোগ্যপাত্রী নহি।"

শরৎসুন্দরীর প্রস্তাবিত কথা, যদিচ বর্ত্তমান কাল-ধর্ম্মানুসারে অনেকেরই অপ্রীতিকর হইতে পারে, কিন্তু সে সময়ের দেশাচার এবং কুলাচার যে প্রণালীর ছিল, তাহাতে শরৎসুন্দরীর ঐ কথা, প্রকৃত পত্নী-ধর্ম্মের অনুরূপ হইয়াছিল। তবে শরৎসুন্দরী পরিণত বয়সে যোগেন্দ্রনারায়ণ জীবিত থাকিলে কিরূপ করিতেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, যোগেন্দ্রনারায়ণ মৃত্যু শয্যাশায়ী হইয়া শরৎসুন্দরীকে চিনিয়াছিলেন। কিন্তু

যখন চিনিলেন, তখন ইহধাম ত্যাগ করিতে হইল। সেই সময়ে ত্রয়োদশ বৎসরের বালিকার হস্তে সম্পত্তির ভার ন্যস্ত করিয়া আপন পত্নীকে চিনিবার নিদর্শন মাত্র রাখিয়া গেলেন। যোগেন্দ্রনারায়ণ আর কিছু দিন জীবিত থাকিলে শরতের নির্ম্মল জ্যোৎস্নায় থাকিয়া সময়ে যে আত্ম-পবিত্রতা লাভ করিতে না পারিতেন, তাহারই বা নিশ্চয় কি ? যোগেন্দ্রনারায়ণ, ক্রমে বুঝিয়াছিলেন যে, তিনি একটী মহৎকার্য্য সাধনে আত্মোৎসর্গ করিয়া তাঁহার চরিত্রের উৎকর্ষতায় নানা কারণে অন্তরায় ঘটিয়াছে। শরৎসুন্দরী তাঁহার নিকট সে কথা উপস্থিত না করিলেও, যোগেন্দ্রনারায়ণ তাঁহাকে কোন কোন দিন আপনার অধঃপাতের বিষয় উল্লেখ করিয়া আপনাকে ধিক্কার দিতেন। শরৎসুন্দরী একে লজ্জাশীলা অল্পবয়স্কা কুলবধূ, তাহাতে তাঁহার আত্মা স্বর্গীয় অনশ্বর সুখের প্রার্থী ছিল, তজ্জন্য পার্থিব নশ্বর সুখের ইচ্ছায় বোধ হয়, পতিদেবতার মনে ব্যথা দিতে চেষ্টা করেন নাই। অনেকে বলিতে পারেন, যে, পতির হিতার্থ কোনও কথা বলিলে তাঁহার হৃদয়ে কিছু কষ্ট হইলেও তাহা, পরিণামে উপকারক। কিন্তু কিছু স্থির চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝাযায় যে, যোগেন্দ্রনারায়ণের মত বুদ্ধিমান ব্যক্তি যাহা দোষাবহ জানিয়াও ত্যাগ করিতে আশক্ত হইয়াছিলেন তাহাতে ত্রয়োদশবর্ষীয়া একটী কুলবধুর উপদেশে কি হইতে পারে ? বরং এরূপ স্থলে উপকারের পরিবর্ত্তে ঘোর অপকারের আশঙ্কাই বিস্তর। সেই উপদেশ স্থান পাত্র এবং কাল বিবেচনায় প্রয়োগের ত্রুটিতে, অনেক দম্পতি বিষময় ফল ভোগ করিয়াছেন। ফলতঃ যদি কেহ বুঝিয়াও আত্ম দৃঢ়তায় অবিশ্বাসী হয়, তবে অন্তের উপদেশে কিছুই হয় না। প্রত্যুত, সেরূপস্থলে তেজস্বী ব্যক্তি বিশেষের হৃদয়ে অন্যের উপদেশ, মর্ম্মভেদী তিরস্কাররূপে পরিণত হয়। এমন

কি, তদ্দ্বারা আত্মহত্যা ইত্যাদি নানাপ্রকার ভীষণকাণ্ডের অভিনয় হইতে কিছুমাত্র অপেক্ষা থাকে না। অতএব, তজ্জন্য বালিকা শরৎ সুন্দরীকে দোষ প্রদান করা যাইতে পারে না। যোগেন্দ্রনারায়ণ, যেরূপ দাতা, সত্যপ্রতিজ্ঞ, পরোপকারী, বুদ্ধিমান এবং স্বাধীনচেতা ছিলেন, তাহাতে শরৎসুন্দরী যে, মহোচ্চহৃদয় স্বামী লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অবশ্য বলা যাইতে পারে। সংসারের নানা আবর্ত্তে পড়িয়া যোগেন্দ্রনারায়ণ যেরূপ বিপদে পতিত হইয়াছিলেন, তাহাতে বালিকা শরৎসুন্দরী, তাঁহাকে আপনার হৃদয়-কপাট খুলিয়া দেখাইবার সময় পাইয়াছিলেন না। দুঃখের বিষয় এই যে, যোগেন্দ্রনারায়ণ বিপদে বিপদে জর্জ্জরীভূত হইয়া আপনার দোষ বুঝিতে পারিয়াও আর শোধিত চিত্র দেখাইবার অবকাশ পাইলেন না।

যোগেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর, শরৎসুন্দরী, যে মস্তক মুণ্ডন করিয়া, তৈল সংস্কারাদি ত্যাগ করিলেন, মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহাই পালন করিয়াছিলেন। পণ্ডিতদিগের নিকট বিধবার কর্ত্তব্যগুলি একে একে বুঝিয়া লইয়া সেই কিঞ্চিদধিক ত্রয়োদশবর্ষ বয়সে ভূমিশয্যায় শয়ন, তৈল-সংস্কারাদি বর্জ্জন, ব্রত উপবাসাদি ঘোরতর ব্রহ্মচর্য্য আরম্ভ করিলেন। তৎকালে তাঁহার পিতা ভৈরবনাথ সান্যাল, তাঁহার প্রধানতম অভিভাবক। ভৈরবনাথ, তরুণ বয়স্কা কন্যার সেইরূপ কঠোর ব্রত পালনে বড়ই দুঃখিত হইলেন। ভৈরবনাথ, কন্যার স্নেহে বাধ্য হইয়া অন্যান্য নিষ্ঠাচারিণী বিধবার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া শরৎসুন্দরীর কঠোর ব্রতের কিছু লাঘব করিবার বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু, কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। এই সময়ে শরৎসুন্দরী অপ্রাপ্ত বয়স্কা বলিয়া, যোগেন্দ্রনারায়ণের সম্পত্তি পুনরায় কোর্টঅব ওয়ার্ডেশ ভার গ্রহণ করিলেন, শরৎসুন্দরীর তাহাতে কিছুই আপত্তি

ছিল না ; কিন্তু, তাঁহার পিতা, অন্যান্য পুরাতন কর্ম্মচারিগণ এবং প্রজাবর্গ, সম্পত্তি আপনার হস্তে লইবার জন্য শরৎসুন্দরীকে সর্ব্বদাই ত্যক্ত আরম্ভ করিলেন। ফলতঃ বিধবা হইবার পর সকলকে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার প্রদান, এবং দীন দুঃখীকে দান করা তাঁহার একটী প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য হইয়াছিল। তাঁহাদের পারিবারিক পদ্ধতি অনুসারে তাঁহার যে কিছু জায়গীর নামক যৌতুকের সম্পত্তি ছিল, তদ্দ্বারা ঐ সকল কার্য্য আশানুরূপ হইতে পারে না বলিয়া, ক্রমে ক্রমে, সম্পত্তির ভার গ্রহণ জন্য তাঁহারও ইচ্ছা হইল। তিনি, এই বয়সে কিরূপ বুদ্ধিমতী এবং সম্পত্তির ভার গ্রহণ করিলে কার্য্যকুশলা হইবেন কিনা, ইহাই দেখাইবার জন্য তৎকালের রাজসাহীর কালেক্টর মিঃ ওয়েল্‌স সাহেবের পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত সকলেরই অভিমত হইল, কিন্তু শরৎসুন্দরী, বিধবা হইয়া কিরূপে ম্লেচ্ছ রমণীর অভ্যর্থনা করিবেন, এই বিবেচনায় তিনি প্রথমে সাক্ষাৎ করিতে অসম্মতা হইলেন। সাহেব পত্নী, সে সময়ে পুঠিয়াতে গিয়াছিলেন, ভৈরবনাথ তাঁহার নিকট গিয়া, করমর্দ্দনাদি কোনও রূপ স্পর্শকার্য্য যে শরৎসুন্দরী করিতে পারিবেন না, সে কথা বুঝাইয়া বলিলেন। ওয়েল্‌স সাহেবের পত্নী, বড়ই সুশীলা মহিলা ছিলেন, তিনি সমস্ত বিষয়েই সম্মতা হইলেন। অবশেষে শরৎসুন্দরী সেই সকল কথা শুনিয়া, পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়ের অনুরোধে অনিচ্ছাতেও সাহেব মহিলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে স্বীকৃতা হইলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে পুঠিয়া রাজ অন্তঃপুরে সাহেব মহিলা যাইয়া শরৎসুন্দরীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি, এই অল্প বয়সে শরৎসুন্দরীর মুণ্ডিত মস্তক, মোটা এক বস্ত্র পরিধান ও রুক্ষ কেশ দেখিয়া মনে মনে বড়ই কষ্ট পাইয়া কথায় কথায় বলিলেন,—“রাণি! আমাদের দেশে

তোমার মত বালিকা বয়সে কাহার বিবাহই হয় না, অথচ তুমি এই বয়সে এরূপ কঠোর কেন করিতেছ?—আমি জানি, তোমাদের শাস্ত্রেও বালবিধবার পুনরায় বিবাহের বিধান আছে, অতএব, তুমি পুনরায় বিবাহ করিলেও ক্ষতি নাই।” শরৎসুন্দরী, নত মুখে এই কথা শুনিয়া অধোবদনে কেবল অনর্গল অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। সাহেব-বনিতা, শরৎসুন্দরীর প্রকৃতি জানিতেন না; কিন্তু, এখন দেখিলেন যে, তিনি ঐ কথা বলিয়া ভাল করেন নাই, সুতরাং নানাপ্রকার মিনতির সহিত পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। ফলতঃ, শরৎসুন্দরীর চিত্ত কিছুতেই আশ্বস্ত হইল না, তিনি, এই দুঃখেই অনুতপ্তা হইতে লাগিলেন যে, তিনি সাক্ষাৎ করিতে সম্মতা না হইলে এই সকল কথা শুনিতে হইত না। যাহা হউক, তিনি, সেই দিন হইতে তিন দিবস অনাহারে রোদন করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন।

অতি অল্পদিন মধ্যেই, কালেক্‌টর সাহেব শরৎসুন্দরীর সুখ্যাতি করিয়া রিপোর্ট করিলেন, এবং তাহাতেই ১২৭২ বঙ্গাব্দের প্রথমে কিঞ্চিদধিক ১৫ বৎসর বয়সে শরৎসুন্দরী কোর্ট অব ওয়ার্ডেশ হইতে সম্পত্তির ভার গ্রহণ করেন। সে সময়ে প্রথমে তাঁহার পিতার ব্যবস্থানুসারেই প্রায় সমস্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইত। কিন্তু, সম্পত্তির ভার গ্রহণের পরই, শরৎসুন্দরী, তীর্থ পর্য্যটনের অভিলাষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, ভৈরবনাথ অল্পবয়স্কা বিধবা কন্যার এই অভিলাষে বাধা দিতে পারিলেন না। কেন না, বিধবা হইবার পর হইতে এপর্য্যন্ত তিনি শরৎসুন্দরীর হৃদয়ে শান্তি সম্পাদনের যে কোনও আয়োজন করিয়াছেন, তাহাতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বিধবা হইবার পর, অনেক সময় শরৎসুন্দরী অনাহারে থাকিতেন, ভৈরবনাথ তাঁহাকে আহার

করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলে, শরৎসুন্দরী, তাহা পালন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাহাতেই বুদ্ধিমতি শরৎসুন্দরী সহজে উপবাসাদি ক্লেশ পাইবার জন্য এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। বিধবার কর্ত্তব্য, একাদশী, শ্রবণাদ্বাদশী, জন্মাষ্টমী, আশ্বিন ও চৈত্র মাসের মহাষ্টমী, রামনবমী প্রভৃতি বিস্তর উপবাস করিয়াও তাঁহার যৌবনের লাবণ্য নষ্ট হয় না বলিয়া বড়ই ব্যাকুলা হইয়াছিলেন। এখন, ব্রতমালা সংগ্রহ করিয়া তাহাতে আর্য্যধর্ম্মের কর্ত্তব্য যতপ্রকার ব্রত আছে, একে একে শরৎসুন্দরী তাহা গ্রহণ করিলেন, এবং তাহার নিয়ম ও উপবাস যাহা (যাহাতে অন্যান্য অনেক ধনী হিন্দু মহিলা, পুরোহিত প্রতিনিধি দিয়া স্বয়ং সুখে ভোজন করিয়া থাকেন) কর্ত্তব্য তাহা স্বয়ং করিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্ভিন্ন ব্রতাদির মিষ্টান্ন সামগ্রী আদি স্বহস্তে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। ভৈরব নাথ পুনঃ পুনঃ চেষ্টায় যখন দেখিলেন, যে তাঁহার কন্যা সামান্যা মানবী নহেন, তখন, আর কোনও প্রকার সুখাভিলাষের জন্য কন্যাকে উত্ত্যক্ত করিতেন না। ইহার মধ্যে আর একটী ঘটনা হইয়াছিল, তাহাও এই স্থানে উল্লেখ যোগ্য। বিধবা হইবার অল্পদিন পরে শরৎসুন্দরী লগ্ন জ্বরে অত্যন্ত কাতরা হইয়াছিলেন। কফানুবন্ধ জ্বরে স্বভাবতই পিপাসা কিছু অধিক হইয়া থাকে, তাহার পর আবার একাদশীর উপবাস উপস্থিত। একাদশীর দিন শরৎসুন্দরী পিপাসায় মূর্চ্ছাপন্না হইলেন। ভৈরব নাথের প্রাণে সহ্য হইল না, তিনি, প্রথমে সমস্ত পাপ স্বয়ং গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়া শরৎসুন্দরীকে জলপানের জন্য নির্ব্বন্ধাতিশয়ে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু পিপাসার যাতনায় ওষ্ঠাগতপ্রাণা শরৎসুন্দরী কিছুতেই পিতার অনুরোধ শুনিলেন না। তখন ভৈরবনাথ বিবেচনা করিলেন যে ধর্ম্মমুগ্ধা বালিকা পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রতি বড়ই

ভক্তিমতী, অতএব তাঁহাদের দ্বারা ব্যবস্থা সংগ্রহ করিতে পারিলে অবশ্যই জল পান করিতে পারেন। ভৈরবনাথ এইরূপ স্থির করিয়া তৎকালে পুঠিয়ায় উপস্থিত পণ্ডিতদিগকে একত্র করিয়া, একাদশীতে বিধবার জল পানের ব্যবস্থার প্রস্তাব করিলেন; তাহাতে কেহ কেহ আপত্তি করিলেন, কেহ কেহ ব্যবস্থা দিলেন। কিন্তু শরৎসুন্দরী অত্যন্ত ঘৃণার সহিত সেই ব্যবস্থা উপেক্ষা করিয়াছিলেন। *

যাহা হউক, কন্যার তীর্থ যাত্রার প্রস্তাবে ভৈরবনাথ অনুমোদন করিলেন। ১২৭২ বঙ্গাব্দের বর্ষাগম সময়ে পিতাকে সঙ্গে লইয়া শরৎসুন্দরী গয়াধামে যাত্রা করিলেন। গয়াকৃত্য অন্তে কাশীতে গিয়া পদব্রজে পঞ্চক্রোশ পর্য্যটন, ও সমস্ত তীর্থে স্নান করিয়াছিলেন। পরে বারাণসী ধাম হইতে প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ পর্য্যটন অন্তে পুনরায় বারাণসীতেই আসিয়াছিলেন। তিনি, বৃন্দাবনে পদব্রজে চতুরশীতি ক্রোশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন; যদি চলিতে অশক্ত হইয়া পড়েন, এই বিবেচনায় ভৈরবনাথ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে একখানি পাল্কী রাখিয়াছিলেন; কিন্তু অসূর্য্যম্পশ্যরূপা শরৎসুন্দরী, ভাদ্রমাসের প্রখর মেঘান্ত রৌদ্রের মধ্যে গমন করিতে বিশেষ কষ্ট পাইলেও, এক মুহূর্ত্তের জন্যও পাল্কীতে আরোহণ করেন নাই। এক এক দিন তাঁহার সুকোমল পদযুগলে কঙ্কর ও কণ্টক বিদ্ধ হইয়া যাতনায় সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যাইতে পারেন নাই, কিন্তু, তথাপি তাঁহার হৃদয়ের দৃঢ়তা ভঙ্গ হইয়াছিল না।

* যে যে পণ্ডিত জল পানের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। শরৎসুন্দরী মনে মনে আজীবনকাল তাঁহাদিগকে ঘৃণা করিতেন। এই ব্যবস্থা উপলক্ষে রাজসাহী অঞ্চলে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। এমন কি কতকগুলি প্রবন্ধ, পুস্তক এবং নাটক পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। "কি ভয়ানক একাদশী" নামে একখানি নাটক রাজসাহীর একটী মুদ্রাযন্ত্রে প্রকাশিত হইবার বিষয়, লেখক অবগত আছে।

কাশীতে প্রত্যাগত হইয়া ভৈরবনাথ ক্রমে পীড়িত হইয়া পড়িলেন। তজ্জন্য তিনি, কাশীবাস মনন করিয়া শরৎসুন্দরীকে পুঠিয়া আসিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু শরৎসুন্দরী তাহাতে সম্মতা হইলেন না। তিনি পতি দেবতার আসন্নকালে শুশ্রূষা করিতে পারিয়া ছিলেন না, বলিয়া সেই অনুতাপে সর্ব্বদা দগ্ধ হইতেছেন, অতএব অসময়ে পিতার নিকট হইতে চলিয়া গেলে পিতার অন্তিমকালে সেবা করিতে পারিবেন না আশঙ্কাতেই, তিনি পুঠিয়া গমনে স্বীকৃতা হইলেন না। একান্ত মনে পিতার চরণোপান্তে বসিয়া স্বহস্তে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। ১২৭৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখমাসে ভৈরবনাথ, স্নেহময়ী কন্যার ক্রোড়ে জীবনের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কাশীলাভ করিলেন।

এই সময়ে শরৎসুন্দরী, প্রকৃত প্রস্তাবে অভিভাবকহীনা হইলেন। পতির সম্পত্তি ব্যতীত পিতার সম্পত্তি এবং মাতা ও বালিকা ভগ্নীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার পর্য্যন্ত তাঁহার উপরেই নিক্ষিপ্ত হইল। অল্প বয়সে তাঁহার প্রতি এইরূপ গুরু ভার পতিত হইলেও, তিনি সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে অতি সাবধানে সকলকার্য্যই সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। অথচ আপনি সর্ব্বপ্রকার সুখ হইতে দূরে থাকিয়া কেবল শত শত কঠোর ব্রত নিয়ম এবং নানাপ্রকার সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মার পবিত্রতা লাভ করিতে লাগিলেন। আতিথ্য, দৈবকার্য্য, পিতৃকার্য্য, দান, পীড়িতের চিকিৎসা, দরিদ্রের সাধ্যমত অভাব মোচন করিয়া অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার নাম প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়া উঠিল। যোগেন্দ্রনারায়ণের সময় হইতে প্রবল ওয়াটসন্ কোম্পানী ও অন্যান্য সরিকের সঙ্গে যে সকল বিবাদ চলিতেছিল, তাহা যতদূর সাধ্য সহজে মীমাংসা করিলেন। যাহা নিতান্ত ক্ষতিকর, অথচ সাহেবেরা স্বার্থ-

ত্যাগে অসম্মত ছিলেন, তাহার জন্য দেওয়ানী মোকদ্দমা করিতে বাধ্যা হইলেন। তাঁহার অকপট সার্ব্বজনীন উদারতায়, নিতান্ত শত্রুও, নত শিরে বাধ্য হইতে লাগিল। অনেক স্থলেই দেখা যায় যে, বহু অংশী থাকিলে পরস্পরের মধ্যে চিরকালই প্রায় কিছু না কিছু বিবাদের সূত্র চলিয়াই থাকে। বরং ধনীদিগের মধ্যে স্ত্রী কর্ত্তৃত্বের সময়, স্বার্থশীল কর্ম্মচারিগণ স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত ঐরূপ জ্ঞাতিবিরোধের নানা কৌশল উদ্ভাবন করিয়া থাকে; কিন্তু মনস্বিনী উদার প্রকৃতি শরৎসুন্দরীর নিকটে কেহই তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বহুদিন হইতে যে যে অংশীদিগের বাড়ীতে গতিবিধির নিয়ম পর্য্যন্ত উঠিয়া গিয়াছিল, তিনি সে সকল স্থানে স্বয়ং যাইয়া সাক্ষাৎ করিয়া এরূপ অকপট আপ্যায়িত করিতেন যে, যদি কাহার মনেও ইচ্ছা না থাকিত, শরৎসুন্দরীর ব্যবহারে তাঁহাকেও চক্ষুলজ্জায়, কৃতজ্ঞতায় বাধ্য না হইয়া উপায় ছিল না। তিনি, অকপট চিত্তে দুর্ব্বল অংশীদিগের যথাসাধ্য অর্থানুকূল্য করিতেও ত্রুটী করিতেন না। * অতএব, তাঁহার সহিত শত্রুতা দূরের কথা, অল্পদিনের মধ্যে সকল অংশীই, তাঁহার বশতাপন্ন হইলেন।

এইরূপে দেশের মধ্যে তাঁহার সুকীর্ত্তি সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। তিনি, যদিচ সমস্ত সম্পত্তির সর্ব্বময়ী কর্ত্রী, তথাপি, প্রধান প্রধান

---

* শরৎসুন্দরীর অপর অংশী, রাজা ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ, দৈবদুর্ব্বিপাকে সমস্ত সম্পত্তি হারাইয়া ছিলেন। তাঁহার পরিবারবর্গকে সুখে তীর্থবাস করিবার এবং সর্ব্বপ্রকারে ভরণপোষণের ব্যয়, শরৎসুন্দরী আনন্দের সহিত বহন করিতেন। তদ্ভিন্ন এক আনার অংশী কুমার গোপালেন্দ্রনারায়ণ রায়ের সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডেশের তত্বাবধানে থাকা কালে কুমারের বিবাহের সম্বন্ধ হয়। কিন্তু রাজানুপালিতের পরিরক্ষক কলেক্টর সাহেব বিবাহের ব্যয় এত সামান্য টাকা দিয়াছিলেন, যে তদ্দারা পুঠিয়া রাজবংশের সম্মান রক্ষা হয় না। শরৎসুন্দরী, আনন্দের সহিত ছয় হাজার টাকা দিয়া বিবাহ নির্ব্বাহ করাইয়াছিলেন। এবং প্রস্তাবিত কুমারের মাতৃশ্রাদ্ধেও বিস্তর টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন।

কর্ম্মচারিদিগের পরামর্শ ব্যতীত, কোনও কর্ম্ম করিতেন না। তিনি, কোনও কার্য্যে একটা কিছু স্থির কল্পনা করিলেও কর্ম্মচারীরা সঙ্গত আপত্তি করিলে, সঙ্কল্পভঙ্গ করিতেন। ফলতঃ তাঁহার দয়া, কিম্বা দানে যদি কেহ বাধা দিতেন, তবে অতি গোপনে যথাসাধ্য আপনার সঙ্কল্প সাধন করিতেন। তাঁহার আপনার জায়গীর সম্পত্তির আয় প্রথমে দশ হাজার টাকা পরিমাণ ছিল, পরে প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয়; তদ্ভিন্ন পতির দত্ত মোসাহেরাদি সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার নিজের বার্ষিক আয় ত্রিশ হাজার টাকা পরিমাণ ছিল। যে সকল দানাদিতে প্রধান কর্ম্মচারীরা বাধা দিতেন, কিম্বা তাঁহার সঙ্কল্পিত পরিমাণ অপেক্ষায় অল্প দিবার পরামর্শ দিতেন, তিনি, দুই একবার মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া যদি, তাঁহার মতে আনিতে না পারিতেন, তবে, গোপনে আপনার তহবিল হইতে সঙ্কল্প মত টাকা দিতেন। তথাপি, কর্ম্মচারিগণ মনে ব্যাথা পাইবেন বলিয়া আপনার মতকে প্রবল রাখিতেন না।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, অন্যের স্বাধীনতায় বাধা কিম্বা কাহারও মনে ব্যথা পাইতে পারে, কথায় কিম্বা কার্য্যে সেরূপ ব্যবহার না করা, তাঁহার প্রকৃতিসম্ভূত সুমহৎ মন্ত্র ছিল। কিন্তু পিতৃ-বিয়োগের অল্পদিন পরে মাতৃভক্তিতে বিগলিত হইয়া এক দিন মাত্র ক্ষণকালের জন্য প্রস্তাবিত মন্ত্র বিস্মৃত হইতেছিলেন। ফলতঃ অল্পক্ষণের মধ্যেই আপনার ভ্রম স্বীকার করিয়া মাতৃভক্তি-প্রবণা বল-বতী ইচ্ছাকে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। ঘটনাটী এইরূপ যে, শরৎসুন্দরী পিতার অভাবের পর স্নেহময়ী মাতার জন্য সর্ব্বদাই চিন্তাযুক্তা থাকিতেন। এক দিন তাঁহার মাতার সামান্য কি একটা পীড়া হইয়াছিল বলিয়া, শরৎসুন্দরী তাঁহাকে দেখিতে পিতৃভবনে যাইতে বড়ই ব্যাকুলা হইলেন। কিন্তু প্রাচীন কর্ম্মচারীদিগের অনুমতি ভিন্ন

যাইতে সাহস করিলেন না। তখন প্রাচীন কর্ম্মচারীদিগকে তাঁহার দরবার ঘরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইলে চিকের অন্তরালে থাকিয়া দাসীর দ্বারা তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। প্রাত্যহিক কার্য্যও এইরূপ উপায়ে দাসীর বাচনিকে হইত ভিন্ন, তিনি কর্ম্মচারীদিগের নিকট আপনার স্বর পর্য্যন্ত সংযত রাখিতেন। যাহা হউক, তাঁহার অভিপ্রায় শুনিয়া একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী কহিলেন যে, তাঁহার পিতৃভবনের অন্তঃপুরের প্রাচীর ভগ্ন হইয়াছে, বাহির হইতে অন্তঃপুরের প্রাঙ্গন দেখা যায়, সুতরাং ঐরূপ অনাবৃত স্থানে গমন করা সঙ্গত নহে। শরৎসুন্দরী তাহাতেও মনোবেগ দমন করিতে না পারিয়া কাকুক্তির সহিত মাতার সঙ্গে সাক্ষাতের অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। তাহাতে উক্ত কর্ম্মচারী কহিলেন যে, তাঁহার মাতা তেমন শয্যা-গতা কাতরা নহেন, অতএব নিতান্ত ইচ্ছা হইলে তাঁহার মাতাকেই পাল্কী যোগে আনাইতে পারেন। কিন্তু শরৎসুন্দরীর নিকট পীড়িতা মাতাকে পথকষ্ট দিয়া আনয়ন করা উচিত বলিয়া বোধ হইল না। অথচ মাতৃদর্শন পিপাসাও নিবৃত্তি হইতেছে না, অতএব তিনি, পিত্রা-লয়ে স্বয়ং যাইবার জন্য পুনরায় উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন সেই কর্ম্মচারী কিছু ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন যে—"রাজা যোগেন্দ্র-নারায়ণের রাণী হইয়া আপনাকে সেই অনাবৃত বাড়ীতে যাইবার জন্য আমরা মত দিতে পারি না; তবে, আপনি এখন কর্ত্রী, যাহা অভিরুচি তাহা করিলে বাধা দিবার কেহই নাই। ফলতঃ আপনি মনে করিয়া দেখিবেন যে, রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ জীবিত থাকিলে আপনি এতদূর স্বাধীনতা প্রকাশ করিতে পারিতেন কি? অতএব যদিও অদ্যকার বিষয় অতিশয় ক্ষুদ্র এবং আপনি তথায় গমন করিলে অন্তঃ-পুর রক্ষার জন্য প্রহরী নিযুক্তও করা যাইতে পারে, কিন্তু, অদ্য এই

সামান্য বিষয়ে আপনার স্বেচ্ছাচার দমন করিতে না পারিলে ভবিষ্যতের জন্য আপনার হৃদয়ের এক আবরণ ধ্বংস হইবে, সুতরাং তদ্দ্বারা আপনার ভবিষ্যজীবনের গুরুতর অনিষ্ট হইতে পারে। আপনি বিবেচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য স্থির করুন।”

বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর কথায় শরৎসুন্দরী সন্তুষ্টা হইয়া আপনার অভিলাষ প্রত্যাখ্যান করিলেন। তখন বুঝিলেন যে, তিনি মাতৃ-ভক্তিতে অন্ধ হইয়া আপনার হৃদয়ের বীজ মন্ত্র বিস্মৃত প্রায় হইয়াছিলেন। তাহার পর হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহাকে আর কোন দিন কেহ, কোনও বিষয়ে প্রস্তাবিত রূপ স্বাধীনতা প্রকাশ করিতে দেখে নাই।

শরৎসুন্দরী ১২৭৩ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। দত্তক গ্রহণ উপলক্ষে বিস্তর দানাদি করিয়াছিলেন। দত্তকের নাম যতীন্দ্রনারায়ণ রাখিয়াছিলেন। এবং ১২৮১ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে তাঁহার উপনয়ন উপলক্ষে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। এবং ১২৮৭ বঙ্গাব্দে ২৪শে ফাল্গুনে দত্তক পুত্রের বিবাহেও দেড় লক্ষের অধিক টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। ফলতঃ এ সকল কার্য্যে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া সাধারণের মনস্তুষ্টির কারণ তৌর্য্যত্রিক বিষয়ের আয়োজন করিতে হইলেও, সংস্কৃত-শাস্ত্র-ব্যবসায়ী পণ্ডিতদিগের ও দীন দুঃখীর সাহায্যে লক্ষাধিক টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। সংস্কৃত শাস্ত্রের উন্নতি এবং যথাসাধ্য দীন দুঃখীর দুঃখ মোচন তাঁহার প্রধানতম কার্য্য ছিল। ঐ সকল কার্য্যে বঙ্গদেশে ও কাশী, মিথিলা এবং কান্যকুব্জ প্রভৃতি দুরদেশবাসী প্রায় পনর শত পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়াছিল। এবং পণ্ডিতদিগের আহারীয় দ্রব্যজাত ব্যতীত শয্যাদি পর্য্যন্ত প্রদত্ত হইয়াছিল। রাজকুমারের বিবাহে পণ্ডিত বিদায়েই প্রায় লক্ষ টাকা এবং দীন দুঃখীদিগের বস্ত্র ও নগদ দানে ত্রিশ সহস্র টাকা ব্যয়িত

হইয়াছিল। সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি পণ্ডিত কিম্বা পুরোহিতের নিকট চিকের অন্তরালে থাকিয়া কাশীখণ্ড ও অন্যান্য অনেক পুরাণ গ্রন্থ ব্যাখ্যা শুনিতে শুনিতে এবং প্রত্যহ স্বয়ং পাঠ করিতে করিতে সংস্কৃতে তাঁহার চমৎকার ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। পুঠিয়ায় তাঁহার সাহায্যে একটী সংস্কৃত চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন পনর ষোলটী ছাত্রকে বিক্রমপুর, নবদ্বীপ ও কাশীতে সম্পূর্ণ ব্যয় দিয়া সংস্কৃত শাস্ত্রে পণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন।

শরৎসুন্দরী অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যাদি নির্ব্বাহ করিতেন। তাহার পর দরবার গৃহে উপবেশন করিয়া প্রধান কর্ম্মচারীদিগের নিকট সম্পত্তি সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয় জ্ঞাত হইয়া আপনার অভিমত ব্যক্ত করিতেন। তাহার পর প্রার্থীদিগের প্রার্থনা শুনিয়া তাহার যথাযথ ব্যবস্থা দিয়া, দিবা দশ ঘটিকার সময় স্নানান্তে বিষ্ণু সহস্র নাম আদি পাঠ, ব্রতাঙ্গ কার্য্য সকল, গো-সেবা, গোগ্রাস দান এবং আহ্নিক পূজা করিতে করিতে দিবা তিনটা উত্তীর্ণ হইত। তাহার পর, অন্যান্য দরিদ্র বিধবাদিগের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিয়া কঠোর হবিষ্যান্ন করিতেন। তাঁহার নিকটে প্রত্যহই নিয়মিতরূপে চল্লিশ পঞ্চাশ জন অনাথা বিধবা বাস করিতেন; ইহা ব্যতীত ভিক্ষার্থিনী হইয়া যাঁহারা একবার রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেন, দুই তিন মাস কালের মধ্যে প্রায়ই তাঁহারা আর যাইতেন না। সকলের জন্য উত্তম উত্তম আহারীয় দ্রব্যের আয়োজন হইত, অথচ তিনি প্রাণ ধারণ উপযুক্ত অতি সামান্য হবিষ্যান্ন করিলেও সকলের সঙ্গে একত্র ভোজন করিতেন। তিনি, পৃথক ভোজন করিলে দুঃখিনীরা মনে কষ্ট পাইতে পারে বলিয়া এবং তাঁহার সাম্য-ধর্ম্মে প্রবণতায় সকলের সঙ্গে একত্রে ভোজন করিতেন। সে ভোজনেও তাঁহার কোনও

নির্দ্দিষ্ট স্থান কি আসন ছিল না। আহারের জন্য সকলে উপবেশন করিলে তিনি হাতে একখানা কদলীপত্র লইয়া তাহার এক পার্শ্বে দরিদ্রার মত উপবেশন করিয়া, কদলীপত্রে যৎসামান্য আহারীয় লইয়া সংযতভাবে ভোজন করিতেন।

এইরূপে আহারান্তে বসিয়া নানা স্থানের সমাগত পত্রগুলি স্বয়ং পাঠ করিতেন। দৈনিক আয় ব্যয়ের হিসাব দেখিবার পর, সাময়িক সংবাদ পত্র, ও ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতেন। ইহার মধ্যে অনাথাদিগের প্রার্থনা শুনিয়া তাহার ব্যবস্থাও করিতেন। তিনি এইভাবে সেই বহু স্ত্রীলোকের হাটের মধ্যে স্বকার্য্য শেষ করিয়া সায়াহ্ন কৃত্য করিতেন। জপ আদি করিতে রাত্রি দশটা অতীত হইত; তাহার পরে শয়ন করিতেন। শয়নেও তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না। একটী দৌড় ঘরের মধ্যে দুই সারি শয্যাপ্রস্তুত হইত, তাহাতে অন্যান্য অনাথাগণ শয়ন করিত; তিনিও তাহাদের মধ্যে এক পার্শ্বে, অতি সামান্য ভাবে কুশাসন কিম্বা কম্বলে ভূমি শয্যায় শয়ন করিতেন। দাসীরা, তাঁহার শরীরের কোন পরিচর্য্যা করিতে পারিত না। তিনি সকলের মধ্যে এইরূপ ভাবে থাকিতেন যে, আহারে, উপবেশনে, শয়নে, কেহই তাঁহা অপেক্ষা সুখে ভিন্ন দুঃখে থাকিত না। সেই, রাজ অন্তঃপুরী-মধ্যে সকলেই সমান অধিকারিণী; যেন তাঁহার কোনই স্বাতন্ত্র্য নাই। কেহ যেন, কোনও বিশেষ ব্যবহারে মনে ব্যথা না পায়, ইহাই তাঁহার সর্ব্বথা চেষ্টা ছিল।

সংসারে কলহপ্রিয়া, হিংসাপরায়ণা স্ত্রীলোকের অভাব নাই। কলহ-কালে তাহারা, স্থান, মর্য্যাদা কিম্বা আপনার অবস্থা অনেক সময়ে ভুলিয়া থাকে। বিশেষতঃ কাহারই স্বেচ্ছাচারে শরৎসুন্দরী অণুমাত্রও বাধা দিতেন না বলিয়া, তাঁহাকে বিস্তর উপদ্রব সহ্য করিতে হইত।

অন্যে নানারূপে জ্বালাতন করিলেও, তিনি একটী কথাও বলিতেন না। প্রার্থিনীদিগের অবস্থা এবং অভাবের তারতম্য থাকিলেও তিনি অভাবের মাত্রা অনুসারে দানে তারতম্য করিলে অন্যে মনে ব্যথা পাইতে পারে, এই কারণে যাহাকে যাহা দিতেন, তাহা গোপনে দিয়া অন্যের নিকটে প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিতেন। এক দিন দুই জন উদ্ধত স্বভাবা বিধবা, ঐরূপে গুপ্ত দান পাইয়া পরস্পরে কে কত পাইল, তাহা পরস্পরের মধ্যে প্রশ্ন করা উপলক্ষে ক্রমে দুই এক কথায় ঘোরতর কলহ আরম্ভ করিল। এস্থলে গৃহস্বামিনী নীরবে থাকিলে মুখরাদিগের অশান্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইয়া থাকে। শরৎসুন্দরী সে সময়ে নিকটেই ছিলেন, তাহাদিগকে উপদেশ দিতে গেলে তাহারা তাঁহার উপদেশ না বুঝিয়া প্রভুত্ব বিস্তার বিবেচনায় মনে ব্যথা পাইতে পারে বলিয়া তিনি কাহাকেও কিছুই বলিতেছেন না। পরিচারিকারাও কিছু বলিতে সাহস পাইতেছে না। কিন্তু নরক-হৃদয়া কলহ পরায়ণাদ্বয়ের নিকটে তাহাও দোষজনক রূপে প্রতিপন্ন হইল। তাহাদের প্রত্যেকের বিশ্বাস যে, অন্য জন মহারাণীর অনুগ্রহে গর্ব্বিতা হইয়া তাহাকে অযথা আক্রমণ করিয়াছে। মহারাণী, এক জনের হইয়া অন্যকে কেন নিবারণ করিতেছেন না, এই বিশ্বাসে তাঁহারা পরস্পরে নানা প্রকার বাদ প্রতিবাদে রাজ অন্তঃপুরী কোলাহলময়ী করিয়া তুলিল। শেষে মুখে মুখে কলহ শেষ না করিয়া উভয়ে দুই খানি ঝাঁটা হাতে লইয়া পরস্পরকে আক্রমণে উপস্থিত হইল। কি উপায় করিবেন ভাবিয়া শরৎসুন্দরী বিহ্বলা হইয়াছেন। কিন্তু, কলহপ্রিয়াদিগের সে বিশ্বাস নাই। তাহারা প্রত্যেকে মনে করিল, "আমি নিরপরাধিনী, কেবল মহারাণীর স্পর্দ্ধায় অন্যে উত্তেজিতা হইয়া আমাকে অপমান করিতেছে। যদি তিনি

নিরপক্ষপাতিনী হইবেন, তবে আমার প্রতিযোগিনীকে এতক্ষণ কেন ঝাঁটা মারিয়া বিদায় করিতেছেন না। অতএব প্রতিযোগিনী দ্বারা আমাকে অপমান করানই শরৎসুন্দরীর মনের ইচ্ছা।” সুতরাং তাহারা পরস্পরে প্রতিযোগিনীর সঙ্গে সঙ্গে নিরপরাধিনী পবিত্র-হৃদয়া শরৎসুন্দরীকেও নানা রূপে কটু কথা বলিতে আরম্ভ করিল। শেষে দুই জনেই সকল বিবাদের আকর বলিয়া শরৎসুন্দরীকে ঝাঁটা মারিতে অগ্রসর হইল। তখন আর পরিচারিকারা স্থির থাকিতে পারিল না। তাহারা রাগান্ধ হইয়া “এতবড় স্পর্দ্ধা” বলিয়া দুই তিন জনে যখন কলহমত্তাদ্বয়কে ধরিতে অগ্রসর হইল, তখন, অসাধারণ ক্ষমাশীলা শরৎসুন্দরী উঠিয়া দাসীদিগকে নিবারণ করিয়া উভয়ের মধ্যে দণ্ডায়-মানা হইয়া কহিলেন,—“মা! আপনারা কেন অনর্থক বিবাদ করিতেছেন, যদি আমার কিছু অপরাধ হইয়া থাকে, তবে আমাকেই ঝাঁটা মারুন” কলহ মুগ্ধারা পূর্ব্বেই দাসীদিগের ভয়ে নীরব হইয়াছিল। তাহার পরে, সেই মূর্ত্তিময়ী শান্তিকে নিকটে দেখিয়া লজ্জায় অধোবদনা হইয়া আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি অতি মিষ্ট কথায় উভয়কেই সান্ত্বনা করিয়া প্রকাশ্যে সমান ভাবে কিছু টাকা দিয়া তাহা-দিগকে বিদায় করিলেন। কি আশ্চর্য্য ক্ষমা! কি চমৎকার মানবদুর্লভ ঔদার্য্য? সেই ভূদেবী ব্যতীত নরলোকে এরূপ সহ্য গুণ আর কাহার হইতে পারে?

মহারাণীর অন্তঃপুরে যে সকল অনাথা বিধবা বাস করিত, তাহাদের সাধারণের পাক এক স্থানে হইত এবং যাহারা স্ব-পাকে আহার করিত, তাহাদের জন্য পৃথক্ পৃথক্ পাকের অনুষ্ঠান হইত। এক দিন, অন্তঃপুরে কয়েকটী নূতন কাঁঠাল আসিয়াছে, মহারাণী স্বয়ং তাহা প্রত্যেককে বিভাগ করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিবার সময়,

একজন স্ব-পাকে আহারকারিণী বিধবাকে পৃথক ভাবে অর্দ্ধ খণ্ড কাঁঠাল দিবার অনুমতি করিয়া নিত্য পূজার জন্য উপবেশন করিয়াছিলেন; পুরোহিত সহস্রনাম আদি পাঠ করিয়া শুনাইতেছেন। এই সময়ে মহারাণীর অভিপ্রায় অনুসারে যে ব্যক্তি কাঁঠাল বিভাগ করিতেছিল, সে, স্ব-পাকে আহারকারিণীকে অর্দ্ধ খণ্ড স্থলে একচতুর্থাংশ কাঁঠাল প্রদান করিলে, সেই উদ্ধত প্রকৃতি কোপনস্বভাবা কহিল যে "আমায় মা অর্দ্ধ খণ্ড কাঁঠাল দিতে অনুমতি করিয়াছেন, তুমি এত কম কেন দিতেছ?" তাহাতে কাঁঠাল দাতৃ কহিল যে, "মা অই পরিমাণই তোমাকে দিতে বলিয়াছেন।" সে সময়ে মহারাণী সহস্রনাম শ্রবণে মৌনী ছিলেন, তিনি সেই কথায় কোন উত্তর করিলেন না দেখিয়া, কোপন-স্বভাবা বিধবা তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধা হইয়া, "কতটুকু কাঁঠাল যে দিতে বলিয়াছে, সে কি আর কাণ খাইয়া শুনিতে পাইতেছে না,—চক্ষু খাইয়া দেখিতে পাইতেছে না। এই যার কাঁঠাল সেই খা'ক্" বলিয়া সেই কাঁঠাল খণ্ড মহারাণীর অভিমুখে ছুড়িয়া ফেলিবামাত্র তাঁহার নিত্য পূজার সমস্ত সজ্জা ছড়াইয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শরীরে পড়িল। কিন্তু তিনি, তাহাতে একটী কথাও বলিলেন না, অন্য সকলে পূজার অনুষ্ঠান নষ্ট হইল, এখন কি উপায় হইবে বলিয়া নানা আক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু, শরৎসুন্দরী মৌন ভঙ্গ করিয়া সেই বিধবাকে অর্দ্ধ খণ্ড কাঁঠাল দিয়া তাহাকে পাক করিবার জন্য নানারূপ সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। পুনরায় আয়োজন করিয়া পূজা করিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। পুরোহিত এই ব্যাপার দেখিয়া ক্রোধে অধৈর্য্য হইলেন। কিন্তু শরৎসুন্দরী এই প্রকারে কত সময়ে যে, আত্মীয় অনাত্মীয় কত জনের কত প্রকার কটু কথা নীরবে সহ্য করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

শরৎসুন্দরী, দীন দরিদ্রকে প্রত্যহ উপস্থিত মত পরিতোষরূপে আহার করাইতেন, এবং যে কোনও ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত হইয়া উপস্থিত হইলেই যথাসম্ভব দান করার ক্ষমতা প্রধান কার্য্যকারকদিগের প্রতিও দিয়াছিলেন। তবে অতিরিক্ত পরিমাণ দান করিতে হইলে তাঁহার অনুমতি লইবার প্রয়োজন হইত। ফলতঃ কর্ম্মচারীদিগের হৃদয় তাঁহার মত উদার হইতে পারে না। অতএব, কর্ম্মচারীদিগের নিকটে দুই টাকার অতিরিক্ত প্রায়, অনেকেই পাইত না। তজ্জন্য অধিকাংশ দরিদ্রই শরৎসুন্দরীর নিকটে প্রার্থী হইত। কর্ম্মচারিগণ, অনেক সময়েই দানে বাধা দিতেন, এবং এরূপও কহিতেন যে, তাঁহার পুত্রের সম্পত্তি, তিনি কেবল রক্ষিকামাত্র; অতএব আয়ের সমস্ত টাকা ব্যয় করার অধিকার তাঁহার নাই। আর সেরূপ করিলে বৃটিস গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কৃতকার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়া সম্পত্তি পুনরায় কোর্ট অব ওয়ার্ডেশের তত্ত্বাধীনে লইবেন। কিন্তু, শরৎসুন্দরী সে কথায় ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। তাঁহার দৃঢ়তর বিশ্বাস ছিল যে, তিনি পুত্রের স্থাবর সম্পত্তি নষ্ট না করিলেই হইল। পুঠিয়ার রাজসংসার চিরদিন ধর্ম্মবলে বলীয়ান্। নগদ টাকা ব্যয়ে অসন্তুষ্ট হইয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহার হস্ত হইতে সম্পত্তি লইলে তাঁহার অণুমাত্রও পরিতাপের বিষয় নাই। ফলতঃ, গবর্ণমেণ্ট, তাঁহার চরিত্রে, তাঁহার সম্পত্তি-শাসন-প্রণালীতে এবং নিঃস্বার্থ দান ধর্ম্মে বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন। আর তাহার ফলস্বরূপ ১২৮১ বঙ্গাব্দে তাঁহাকে রাণী উপাধি এবং ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর প্রসিদ্ধ দরবার কালে মহারাণী উপাধিতে ভূষিতা করিয়াছিলেন। কিন্তু উপাধি পাইয়া তিনি সন্তোষের পরিবর্ত্তে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। রাজসাহীর কালেক্টর সাহেব, তাঁহাকে মহারাণী উপাধি লাভের বিষয় সংবাদ দিলে তিনি সাহেবকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, "আমার ন্যায় হিন্দু

বিধবার এই সকল উপাধি ঘোরতর বিড়ম্বনা মাত্র, তবে রাজপ্রসাদ উপেক্ষা করিতে পারি না বলিয়াই ইহা গ্রহণ করিলাম।"

যাহাহউক, কর্ম্মচারীদিগের নানারূপ প্রতিবন্ধকতা থাকিলেও তিনি ইচ্ছামত দানে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন না। তিনি যাহাকে যাহা দিতে অনুমতি করিতেন, কর্ম্মচারীরা তাহার অর্দ্ধেক টাকা দিতে অনুমোদন করিতেন; বালিকা কন্যাগণ, যে প্রণালীতে পিতার নিকট হইতে কোন অনুকূল অভিপ্রায় লইয়া থাকে, তিনি প্রথমে কর্ম্মচারীদিগের নিকট সেইরূপ কন্যার ন্যায় বিনয়ে আপনার ইপ্সিত কার্য্যে অনুমোদন প্রাপ্তির চেষ্টা করিতেন। একান্ত তাহাতেও কর্ম্মচারিগণ সম্মত না হইলে তাঁহাদের অগোচরে অতি গোপনে আপনার জায়গীরের আয় হইতে বক্রী টাকা দিতেন। যে সময়ে আপনার হাতে টাকা না থাকিত তখন, কর্ম্মচারীদিগের নিকট ঋণ করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিতেন, যদি কর্ম্মচারীরা তাহাতেও অসম্মত হইতেন, তখন, পাঁচ বৎসরের বালিকার ন্যায় রোদন করিতেন, এবং যে পর্য্যন্ত প্রার্থীকে ইচ্ছামত দান করিতে না পারিতেন, সে পর্য্যন্ত অনাহারে থাকিতেন। তথাপি, ঐ টাকা দিবার জন্য কর্ম্মচারীদিগের মতের বিরুদ্ধে আদেশ করিতেন না। তাঁহার এইরূপ দানশীলতার প্রভাব দেখিয়া পরে কর্ম্মচারীরা তাঁহার ইচ্ছানুরূপ দানে প্রায়শই সম্মতি প্রদান করিতেন। কর্ম্মচারীদিগের দান সম্বন্ধে মতামতের বিষয় একটী ঘটনা এস্থানে উল্লেখ যোগ্য।

পুঁঠিয়া নিবাসী একটী সৎকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক; সামান্য আয়ে বহুপরিবার পোষণে কষ্ট পাইতেন। তাঁহার দুটী পুত্র ইংরেজী বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়া পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল। বালক দুটী নম্র, সত্যবাদী এবং সুশীল। পিতৃ বিয়োগের পর মহারাণী

শরৎসুন্দরী সময়ে সময়ে সাহায্য করিতেন। একবার একটী পরীক্ষার ফি ইত্যাদিতে তাহাদের এক শত টাকার প্রয়োজন হয়। সুশীল বালকদ্বয় যতদূর সাধ্য আপনার চেষ্টায় সংগ্রহ করিতে পারিলে কদাচই মহারাণীর নিকটে প্রার্থনা করিতেন না। কিন্তু এবার এক শত টাকার মধ্যে বহু কষ্টে পঞ্চাশ টাকা মাত্র সংগ্রহ হইয়াছিল। তাহারা এত বেশী টাকা মহারাণীর নিকটে স্বয়ং প্রার্থনা করিতে কুণ্ঠিত হইয়া শুনিতে পাইলেন যে, রাজসাহী হইতে একজন প্রধান উকিল মহারাণীর সদনে আসিয়াছেন। বালক দুইটী উকিল বাবুর নিকট গিয়া এই বিষয়ে কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা এবং তাহাদের সম্বন্ধে মহারাণীকে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলেন। উকিল বাবু, বালকদ্বয়ের মুখে সমস্ত অবস্থা শুনিয়া বলিলেন যে, "মহারাণীর অদেয় কিছুই নাই, এবং তাঁহার উদার প্রকৃতির নিকট তোমাদের প্রার্থনাও অতি সামান্য, অতএব এজন্য আমাকে অনুরোধ করিতে হইবে না। ফলতঃ কর্ম্মচারীরা দানে বড়ই বাধা দিয়া থাকেন, অথচ মহারাণী কর্ম্মচারীদিগের অনুমোদন ব্যতীত কিছুই করেন না। আমি জানি যে, মহারাণী যাহাকে যাহা দিতে বলেন, কর্ম্মচারীরা তাহার অর্দ্ধেক মাত্র দিতে অনুমোদন করিয়া থাকেন। তোমাদের যে এক শত টাকার প্রয়োজন তাহা বলিলেই মহারাণী সমস্তই দিতে অনুমতি করিবেন, আর কর্ম্মচারীরা,তাহার অর্দ্ধেক মাত্র অনুমোদন করিবেন, অতএব তোমরাও প্রয়োজনীয় পঞ্চাশ টাকা পাইবে।" তাঁহার উপদেশমত বালকদ্বয় মহারাণীর নিকট অতি কাতর ভাবে উপস্থিত হইলেই, তিনি, প্রশ্ন করিয়া অভাব অবগত হইলেন। সে সময়ে শীতকাল, বালকদ্বয়ের শরীরে অতি সামান্য শীতবস্ত্র ছিল। তাহারা পুস্তকের মূল্য এবং পরীক্ষার ফির এক শত টাকা প্রয়োজন, এইমাত্র বলিতেই তিনি, দশ টাকা মূল্যে

বালকদ্বয়কে দুইখানি শীতবস্ত্র আনাইয়া দিলেন। তাহার পরে প্রস্তাবিত এক শত টাকা দিবার জন্য কর্ম্মচারীদিগকে অনুরোধ করিলেও তাঁহারা অনেক চেষ্টায় পঞ্চাশ টাকা দিতে অনুমোদন করিলেন। মহারাণী কর্ম্মচারীদিগের নিকট হইতে টাকা লইয়া যাইবার সময় বালকদ্বয়কে তাঁহার সহিত আর একবার দেখা করিতে বলিয়া দিলেন। বালকদ্বয় কর্ম্মচারীদিগের নিকটে টাকা লইয়া মহারাণীর আদেশ পালন জন্য তাঁহার সমীপে গমন করিল। তখন, ক্ষমা, দান ও উদারতার প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি, কর্ম্ম সন্ন্যাসিনী, স্মিত-পূর্ব্ব-ভাষিণী শরৎ-সুন্দরী, নানা মিষ্ট কথায় বালকদ্বয়কে সান্ত্বনা করিয়া আপনার নিকট হইতে পঞ্চাশ টাকা দিয়া এই দানের বিষয় অন্যের নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। দয়া রূপিনী ভূদেবী শরৎসুন্দরীর উদারতায় সুশীল সত্যবাদী বালকদ্বয় কৃতজ্ঞতার আনন্দে অশ্রুপূর্ণ হইয়া তাহাদের এক শত টাকা প্রয়োজন হইলেও, কোনরূপে পঞ্চাশ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, তথাপি তাহারা কেবল উকিল বাবুর উপদেশ অনুসারে যে এক শত টাকা প্রার্থনা করিয়াছিল, তাহার আনুর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্তই বলিয়া টাকা লইতে অসম্মত হইল। কিন্তু দেবীর কল্পনা অন্যথা হইতে পারে না। তিনি সমস্ত অবস্থা শুনিয়াও অবশিষ্ট পঞ্চাশ টাকা তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিয়া প্রদান করিলেন। *

মহারাণী সর্ব্বপ্রকার ব্রত নিয়ম, পূজা, দান এবং তীর্থ দর্শনাদি শাস্ত্রদৃষ্ট পদ্ধতি অনুসারে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতেন। ইহা ভিন্ন সকল কার্য্যেই ব্রাহ্মণ ও দীন দুঃখীকে আহার প্রদান এবং শাস্ত্রব্যবসায়ী

* এই বালকদ্বয় এখন কৃতবিদ্য হইয়া, বিশেষ প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন। এবং তাঁহাদের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ, তিনি, একদিন ইচ্ছা পুর্ব্বক লেখককে এই বিষয়টী বলিয়াছেন।

কিম্বা অব্যবসায়ী অথচ অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া যথাসাধ্য দান করিতেন। দেশের মধ্যে নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে পণ্ডিতগণ সমাগত হইলে, মহারাণী তাঁহাদিগকে রাজধানীতে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইয়া যথোপযুক্ত টাকা প্রদান করিতেন। যদি কোনও কারণে নিয়মিতরূপে মাসিক কিম্বা বার্ষিক দান তাঁহার পুত্রের সম্পত্তিতে বহন করিতে না পারে, বলিয়া এক এক উপলক্ষে পণ্ডিত-মণ্ডলী এবং দীন দরিদ্রকে প্রচুর টাকা দান করিতেন। কেবল দানের জন্য বৎসর বৎসর অন্নপূর্ণা পূজা এবং জগদ্ধাত্রী পূজা বহু ব্যয়ে নির্ব্বাহ করিতেন। এই দুই কার্য্যে প্রকৃতই অন্নপূর্ণার ন্যায় অন্ন দান করিতেন। তিনি শত শত ব্রত করিয়াছেন, সহস্র সহস্র প্রকারে দান করিয়াছেন। দানধর্ম্মের জন্য তিনি, নানা উপায় উদ্ভাবন করিতেন। কেননা, উপলক্ষ ব্যতীত অনেক সময়ে তাঁহার কর্ম্মচারিগণ দানে প্রতিবন্ধকতা করিত। সেই জন্য এক একটী ব্রত কিম্বা পূজা আরম্ভ করিয়া তদুপলক্ষে ইচ্ছামত দানাদি করিতেন। সামান্য সামান্য ব্রতাদিতে তাঁহার দানের প্রণালী দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইত। উদাহরণ স্থলে কয়েকটী বিষয় মাত্র উল্লেখ করা যাইতেছে।

অনন্তচতুর্দ্দশী ব্রত প্রতিষ্ঠার সময় এক প্রস্থ স্বর্ণের ভোজনপাত্র এবং স্বর্ণের বহুগুণা প্রভৃতি পাকপাত্র এবং এত পরিমাণ আভরণ দান করিয়াছিলেন যে, তাহার সমষ্টি মূল্য প্রায় পনর হাজার টাকা হইবে। আর একটী পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠায় প্রায় ছয় সাত হাজার টাকার অলঙ্কার আদি দান করিয়াছিলেন। অনেকবার শীতকালে, পুঠিয়া রাজধানীতে, রামপুর বোয়ালিয়া নগরে এবং বারাণসীক্ষেত্রে ঢোল দিয়া দরিদ্রদিগকে সংগ্রহ করিয়া নির্ব্বিশেষে শীতবস্ত্র ও কম্বলাদি দান করিতেন। একবার কাশীধামে, সমস্ত তীর্থবাসী পাণ্ডাগণকে প্রায় দশ হাজার টাকার শাল

বনাত বিতরণ করিয়াছিলেন। তিনি, ইহা ভিন্ন সাধারণ হিতার্থে পুঠিয়ায় ও মধুখালি গ্রামে ছাত্রবৃত্তি, এবং লালপুর ও ঝাওইল গ্রামে মাইনর স্কুল স্থাপন, এবং কালীগ্রাম প্রভৃতি স্থানে বিস্তর পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। লালপুর ও ঝাওইলে প্রথম শ্রেণীর দুইটী চিকিৎসালয় এবং পুঠিয়াতে একটী সংস্কৃত চতুষ্পাঠী সংস্থাপন করিয়াছিলেন। রাজসাহীর ইংরেজী বিদ্যালয়ের গৃহ, তাঁহার পতি রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, সেই বিদ্যালয় কলেজে পরিণত হইলে, মহারাণী শরৎসুন্দরী কলেজের চতুর্দ্দিকে সুন্দর প্রাচীর ও রেলিং এবং কলেজ গৃহ নির্ম্মাণার্থে এককালীন এগার হাজার টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। পুঠিয়া রাজধানীতে একজন ভাল কবিরাজ ও ডাক্তার নিযুক্ত করিয়া এবং কালীগ্রামে একজন কবিরাজ নিযুক্ত করিয়া দীন দুঃখীর চিকিৎসা করাইতেন। তদ্ভিন্ন পুঠিয়া রাজধানীতে একটী পুস্তকালয় ও কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপনে বিস্তর টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। অসমর্থ লোকের চিকিৎসা ব্যয়, তীর্থ গমন ও তীর্থ বাসের ব্যয়, বিদ্যালয়, এবং চতুষ্পাঠীতে পাঠের ব্যয়, পরীক্ষার ফি, নানা স্থানের বিদ্যালয় প্রভৃতির গৃহ নির্ম্মাণের ব্যয়, মাসিক সাহায্য আদিতে এবং স্থানে স্থানে জলাশয় নির্ম্মাণ, ও পথ প্রস্তুতের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত পুঠিয়া রাজধানীর প্রকাণ্ড পরিখা, অদ্যাপি তাঁহার সুকীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

১২৭৮ বঙ্গাব্দে রাজসাহী প্রদেশে অত্যন্ত বন্যার প্রাদুর্ভাব হয়। নিম্ন ভূমির সহস্র সহস্র গো ছাগাদি গ্রাম্য জন্তু সহ সহস্র সহস্র লোক চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। তিনি এক মাসের অধিক কাল ন্যূনাধিক চারি সহস্র মনুষ্যকে এবং বিস্তর

গবাদি জন্তুকে পরিতোষরূপে আশ্রয় এবং আহার প্রদান করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন ১২৮০ এবং ৮১ বঙ্গাব্দের ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় তিনি, প্রত্যহ পাঁচ সহস্র লোককে আহার দিয়াছিলেন, পরে ক্রমে বিস্তর লোক সংখ্যা বৃদ্ধিতে, সর্ব্ব জাতিকে পাক করিয়া আহার প্রদানে অসুবিধা হইয়া উঠিলে, তিন চারি মাসকাল অসংখ্য লোককে তণ্ডুলাদি আহারীয় দ্রব্য এবং নগদ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন।

কোনও ব্যক্তি সম্পত্তি রক্ষার জন্য তাঁহার নিকটে আশ্রয় ভিক্ষা করিলে, অনেককে তিনি বিনাশুদে ঋণ দিয়া এবং সেই ঋণ পরিশোধে অশক্ত হইলে, তাহা মাপ দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার সহিত মোকদ্দমায় পরাভব হইয়া, যদি অতি ধনাঢ্য ব্যক্তিও তাঁহার শরণাপন্ন হইতেন, তবে তাঁহাকেও তিনি প্রচুর অর্থ মাপ দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কোনও একটী মোকদ্দমায় কলিকাতার মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কে, সি, এস, আই, বাহাদুরকে ন্যূনাধিক এক বিংশতি সহস্র টাকা, এবং গবর্ণমেণ্টের একটী মোকদ্দমার ওয়াশীলাতের ছয় সাত সহস্র টাকা মাপ দিয়াছিলেন।

পুস্তক মুদ্রণ কার্য্যে বিস্তর গ্রন্থকার তাঁহার প্রচুর সাহায্যে কৃতার্থ হইয়াছেন। মহাভারত প্রচারক প্রসিদ্ধ প্রতাপচন্দ্র রায় সি, এস, আই, মহারাণীর নিকট যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াই মহাভারতের অনুবাদ-প্রচারে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

মহারাণীর দত্তক পুত্রের বিবাহ নিমিত্ত দুইটী পাত্রী মনোনীত হইয়াছিল। তন্মধ্যে এক জনের সঙ্গে বিবাহ হয়; অন্যটী মহিষাডেরার ত্রৈলোক্যনাথ গোস্বামীর কন্যা। এই কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ-প্রস্তাব উপস্থিত ছিল বলিয়া মহারাণী সেই কন্যার অন্যত্র বিবাহের সমস্ত ব্যয় প্রদান করিয়াছিলেন।

পুঠিয়া, বৃন্দাবন, এবং কাশীধামের দেবালয় নির্ম্মাণে ও অন্নসত্রের উন্নতির জন্য বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। অন্নসত্রে প্রতি বৎসর তিন চারি হাজার টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করিতেন। ইহা ভিন্ন মহারাণী গুরু, পুরোহিত, প্রাচীন কর্ম্মচারী, অনাথা বিধবা, অসমর্থ প্রাচীন, প্রায় দুই শত ব্যক্তিকে গ্রাসাচ্ছাদন দিয়া প্রতিপালন করিতেন। ইহা ভিন্ন তাঁহার অন্তঃপুরী দুঃখিনীর হাট ছিল।

তাঁহার অমানুষী ক্ষমাশীলতা এবং ত্যাগ স্বীকারের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত থাকিলেও, নিম্নের ঘটনা কয়টী এস্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে। কোনও এক উদ্ধত-স্বভাবা ব্রাহ্মণের বিধবা কতকখানি ভূমির বিষয় মীমাংসা-জন্য মহারাণীর নিকট আসিয়াছিল। তিনিও সত্বরেই তদ্বিষয় অনু-সন্ধান করিয়া, প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাপন জন্য কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু নানা কার্য্যের গোলোযোগে তাহাতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। প্রার্থিনী, প্রত্যহ রাজভোগে সুখে থাকিয়াও মহারাণী কেন, কর্ম্মচারীদিগকে ধম্‌ক দিয়া কি দণ্ড করিয়া দুই চারি দিনের মধ্যেই তাহার অনুকূল আজ্ঞা করেন না, এই সন্দেহে সেই উদ্ধত-স্বভাবার ক্রমে বিরক্তি এবং ক্রোধ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই সময়ে মহারাণীর একটী ভগিনীপুত্রের অকাল মৃত্যু হইয়াছিল সুতরাং কিছুদিন মহারাণী রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারিবেন না, ইহাতে আরও বিলম্ব হইবে বলিয়া সেই মন্যুময়ী বিধবা স্বার্থান্ধ হইয়া মহারাণীর সেই শোকসময়েই তাঁহাকে বিরক্ত আরম্ভ করিল। তিনি পুনরায় তদন্তের ফল শীঘ্র জানার জন্য কর্ম্মচারীদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু বিধবার তাহা সহ্য হইল না। সে মহারাণীকে যতদূর সাধ্য কটু কথা বলিয়া শাপ প্রদান করিতে লাগিল, এবং তাহারই অভিসম্পাতে তাঁহার ভগিনীপুত্রের মৃত্যু হইয়াছে একথাও

বলিতে কুণ্ঠিতা হইল না। তাহার কটুভাষায় দাসীরা রাগান্ধ হইয়া উঠিলেই, মহারাণী তাহাদিগের প্রতি বিরক্তি প্রকাশে নিবারণ করিলেন; আর আপনার ত্রুটি বিশ্বাসে সেই মুহূর্ত্তে প্রধান কর্ম্মচারীকে ডাকাইয়া বিধবার প্রার্থিত ভূমি তাহার দখলেরাখার আদেশ প্রদান করিয়া বিধবাকে উপযুক্ত পাথেয় আদি দিয়া মিষ্ট ভাষায় ত্রুটি মার্জ্জনা চাহিলেন। নরক-হৃদয়া বিধবা তখন বুঝিলেন যে, মৃদুচরিত্রা মিষ্টভাষিণী শরৎসুন্দরী বাস্তবিকই মানবী নহেন। সে আত্মগ্লানিতে এরূপ ব্যাকুল হইয়াছিল যে, আর কোনও উত্তরই করিতে পারিল না।

আর এক সময়ে মহারাণীর পুত্রের বিবাহের উৎসব মধ্যে সধবা বিধবা প্রায় তিনশত স্ত্রীলোক অন্তঃপুরে সমাগতা হইয়াছিলেন। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, তিনি সকলের সঙ্গে একত্রে, অথচ অন্যে ভাল শয্যায় এবং তিনি সামান্য শয্যায় শয়ন করিতেন। একটী দৌড়-ঘর, মধ্যে পথ রাখিয়া উভয় দিকে দরিদ্রা অদরিদ্রা সকলের জন্যই নির্ব্বিশেষ শয্যা প্রস্তুত হইয়াছে। সেই দুই পার্শ্বের শয্যায় প্রায় এক-শত ব্রাহ্মণকন্যা শয়ন করিয়াছেন। সেই পংক্তির মধ্যে এক পার্শ্বে তাঁহার কম্বল শয্যা ও তাহার পার্শ্বে তাঁহার পুত্রের শয্যা প্রস্তুত হইয়াছে। সকলেই শয়ন করিয়াছেন। এই গৃহটী দ্বিতল, নিম্নতল ব্যতীত মলমূত্র ত্যাগের স্থান ছিল না। একটী প্রাচীনা দ্বিতল হইতে অবতরণের সিঁড়ির বিপরীত প্রান্তে শয়ানা ছিলেন। শেষ রাত্রিতে তাঁহার উদর বিকার জন্মায়, তিনি সেই শয্যা পংক্তির মধ্যস্থিত সঙ্কীর্ণ পথে সিঁড়ির অভিমুখে যাইতে যাইতে বেগ ধারণে অসমর্থা হইলেন। পথে মলত্যাগ করিতে করিতে নিম্নে মলত্যাগ স্থল পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। কিন্তু, শেষে লজ্জায় ম্রিয়মাণা হইয়া আপনার শয্যায় আসিয়া শয়ন

করেন। প্রভাতে মহারাণী, নানা দেবদেবী এবং তীর্থাদির নাম পাঠ করিতেছেন, এমন সময়ে সকলেই জাগরিত হইয়া উঠিয়াই পথে মলের ছড়া দেখিতে পাইল। তাহার মধ্যে কেহ কেহ আচার নিষ্ঠার ভাণ করিয়া সেই ব্যাধিগ্রস্তা প্রাচীনাকে নানারূপ ভর্ৎসনা আরম্ভ করিল। মহারাণী, তাহাদের ভূমিকা শুনিয়াই আপনার ইষ্টচিন্তা ত্যাগ পূর্ব্বক শয্যা হইতে উঠিলেন। উঠিয়া সকলের নিকট করজোড়ে এই বিষয় আলোচনা করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু পরান্ন ধ্বংশ-শীলা উগ্রচণ্ডাদিগের তাহাতেও ক্রোধের নিবৃত্তি হইল না; তাহারা এখন মলাকীর্ণ পথে কিরূপে অশুচি হইয়া বাহির হইবে, এই এক উপ-লক্ষ করিয়া আপনার আপনার মনোবেগ প্রকাশ করিতে লাগিল। উদরাময়গ্রস্তা প্রাচীনা, লজ্জায় মৃতপ্রায় হইয়া শয্যায় শয়ন করিয়া পুনঃ পুনঃ ভগবানের নিকট মৃত্যুকামনা করিতে লাগিল। তখন, মহারাণী গোপনে পরিচারিকাদিগকে নানারূপ মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া বলিলেন যে, মাতৃসম-বয়স্কা ব্রাহ্মণ-কন্যার এই পীড়ার কালে মল পরিষ্কার করিলে কোন দোষ নাই। কিন্তু প্রধানা দাসী, নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া তীব্রভাষায় তাঁহার এই অযথা অনুরোধের নিন্দা করিতে লাগিল। ফলতঃ সেই দাসী, অল্পদিন পূর্ব্বে আপনার ভ্রাতার বিবা-হের ব্যয় বলিয়া মহারাণীর নিকট দুই হাজার টাকা পাইয়াছে, তথাপি সে কৃতজ্ঞতা ভুলিয়া গেল। সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য অনেকেই, উপলক্ষ পাইয়া আত্মপ্রকৃতির পরিচয় দিতে ত্রুটি করিলেন না। স্বর্গীয় দেবী নির্ব্বিকারহৃদয়া মহারাণী শরৎসুন্দরী, তজ্জন্য দাসীদিগকে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া স্বহস্তে ঝাঁটা লইয়া পথের সমস্ত মল পরিষ্কার করিয়া দিয়া, এই সমস্ত বিষয় যেন অন্যে শুনিতে না পায় তজ্জন্য বিনয়ের সহিত সকলকে বলিলেন। পরান্ন পোষিণী নিন্দুক স্বভাবা

নারীগণ, তাঁহার দেবী চরিত্রে এককালে অবাক্ হইয়া রহিল। তাহার পর সেই পীড়িতা প্রাচীনাকে কহিলেন,—"মা! ইহাতে আপনার লজ্জার বিষয় কিছুই নাই; শরীর অসমর্থ হইলে কে না এইরূপ করিয়া থাকে? তবে সে সময়ে আপনার আপনার বাড়ীতে হয় বলিয়া অন্যে তাহা জানিতে পারে না। এই বাড়ীও আপনার এবং আমাকেও আপনার কন্যার ন্যায় বিবেচনা করিয়া সমস্ত মনোকষ্ট ভুলিয়া যাইবেন।"

তাহার পর তাঁহার পুত্র শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে যাইবার সময়ে পরদুঃখকাতরা মহারাণী তাঁহাকে গোপনে বলিলেন যে, "পীড়া হইলে সকলেরই এইরূপ অসামর্থ্য জন্মে। এক দিন আমারও এই দশা হইতে পারে। ফলতঃ স্ত্রীলোক বড় লজ্জাশীলা। এই সকল দুর্ঘটনায় তাহারা মৃত্যুবৎ লজ্জা পাইয়া থাকে। অতএব বাবা! আমার দিব্য, একথা যেন, অন্যের নিকট প্রকাশ না হয়। তাহা হইলে প্রাচীনা সম্ভবতঃ লজ্জায় আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিতে পারে।" অতি নিরন্ন দরিদ্রেরও এতদূর পরোপকারীতা, নির্ব্বিকার ভাব এবং এত নিরভিমানিতা হইতে পারে কি না সন্দেহ।

এই সময়ে মহারাণীর কাশীযাত্রাকালে "কুল-শাস্ত্র-দীপিকা" গ্রন্থে এবং "বঙ্গবাসী" সংবাদপত্রে মহারাণী শরৎসুন্দরী সম্বন্ধে যে যে কথা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইহা ভিন্ন, শত শত ইংরেজী বাঙ্গালা, উর্দ্দূভাষার সংবাদ পত্রসকলে এবং গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারকদিগের শত শত পত্রে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

"রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ, লোকান্তরিত হইলে তৎপত্নী শ্রীমতী মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী রাজ্যাধিকার লাভ করেন। ইনিও তৎকালে অল্প বয়স্কা ছিলেন। দৈবের প্রতিকূলে বিধির বিপাকে

এই পুণ্যশীলা ও প্রাতঃস্মরণীয়া রমণীকে অকালে জীবনের প্রথম ভাগেই নিদারুণ বৈধব্য-দশায় নিপতিত হইতে হইল। ইনি স্বীয় মহামূল্যবান্ জীবনকে তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানে নিয়ত ধর্ম্মকার্য্যে, দেবসেবায়, এবং তীর্থ পর্য্যটনে সময়াতিবাহিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। গয়া, কাশী প্রয়াগ এবং শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ পর্য্যটন করতঃ বারাণসীতে প্রত্যাগমনকালে ইহাঁর জনক তথায় মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। রাণী শরৎসুন্দরী বারাণসীতে মহাসমারোহে পিতৃ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সমাপনান্তে পুঠিয়াতে প্রত্যাগমন করতঃ রাজত্ব ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। অন্যান্য অপরিণামদর্শী ও প্রজাপীড়ক ভূম্যধিকারিগণের ন্যায় ইহাঁর হৃদয় ও অন্তঃকরণ পাষাণ নির্ম্মিত নহে। ইনি অপত্যস্নেহে প্রজাবৃন্দের দুঃখমোচন ও সুখ বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। ইহাঁর দানশীলতা ও পরোপকারিতা জগদ্বিখ্যাত। অনেক স্থানে দরিদ্রবৃন্দের চিকিৎসার্থ দাতব্য ঔষধালয় এবং দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত দেশে বিপুল অর্থ প্রদান করতঃ লোকের অন্নকষ্ট নিবারণে নিয়তই যত্নবতী। ১৮৭৭ সালে দিল্লীর দরবারে ইনি মহারাণী উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মহারাণী শ্রীমতী শরৎসুন্দরী দেবী সমস্ত বঙ্গসাম্রাজ্যের রমণী-কুলের শিরোভূষণ। ইনি মহারাণী ভবানীর ন্যায় লোকমণ্ডলীর প্রাতঃস্মরণীয়া। ইনি বারেন্দ্র ভূমির গৌরব ও অত্যুজ্জ্বল রত্নস্বরূপা। ইহাঁর বিশুদ্ধ চরিত্র, পবিত্র দেবভাব, দানশীলতা ও সহানুভূতি জগজ্জনের অনুকরণীয় আদর্শ। ইনি প্রতি দিন শত শত অনাথা চিরদুঃখিনী বিধবাগণের ভরণপোষণ করেন। রোগ ও জরাগ্রস্তা মুমূর্ষু দুঃখিনীগণের মৃত্যু-শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্টা হইয়া স্বয়ং তাহাদিগের সেবা ও শুশ্রূষা করিয়া থাকেন। নারী চরিত্র কতদূর উৎকৃষ্টতা

লাভ করিতে পারে, মানবীয় কুপ্রবৃত্তিনিচয় ধর্ম্মচর্চ্চার মহীয়সী শক্তিতে কতদূর পর্য্যন্ত নিস্তেজ হইতে পারে, ইনি তাহার জীবিত দৃষ্টান্ত স্থল। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়াও আহার, বিহার এবং ভোগ-বিলাসাদিকে পদতলে দলিত করতঃ বিশুদ্ধ ধর্ম্মের জন্য, পরোপকারের জন্য আপনার জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছেন। এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পাশ্চত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে বঙ্গীয় ললনাগণ, পরণপরিচ্ছদ এবং ভোগ-বিলাসে অনুক্ষণ নিরতা রহিয়াছেন; কিন্তু পবিত্র চরিত্রা মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী, পূর্ণ যৌবনা ও অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়াও, প্রাচীনা ভারত মহিলাগণের গৌরবের স্থল। ইনি সতীত্ব, ধর্ম্মনিষ্ঠা, ত্যাগ স্বীকার, ও বিষয়বাসনা পরিত্যাগ প্রভৃতি সদ্গুণের মহদাদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন। কি ইংরেজ, কি বঙ্গবাসী, কি হিন্দুস্থানী, সকলেই একবাক্যে এক হৃদয়ে ইহাঁর যশোকীর্ত্তন করিতেছেন।” কুলশাস্ত্র দীপিকা, ৫২ পৃঃ হইতে ৫৫ পৃষ্ঠা।

সংবাদ পত্রের অভিমত নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

“নূতন বৎসরের প্রথম দিনে মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী বিষয় ভার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা বাঙ্গালির পক্ষে শুভসংবাদ নহে। অলৌকিক ধর্ম্মভাব এবং দানশীলতার জন্য বঙ্গদেশে শরৎসুন্দরী প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়াছেন। হিন্দু সন্তানের চক্ষে তিনি পবিত্রা আর্য্যনারী-কুলের আদর্শ-স্বরূপা। অন্য ধর্ম্মাবলম্বীগণও একবাক্যে তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। এরূপ বিশ্বজনীন ভক্তি-প্রীতি যাঁহার পুরস্কার, তাঁহার জীবনী আলোচনায় পুণ্য আছে।

১২৫৬ সালের আশ্বিন মাসে মহারাণী জন্মগ্রহণ করেন। নিজ পুঠিয়াতেই তাঁহার পিত্রালয়। পিতা স্বর্গীয় ভৈরবনাথ সান্যাল মহাশয় পুঠিয়ার একজন সম্ভ্রান্ত জমিদার। তিনি গোঁড়া হিন্দু ছিলেন; হিন্দু-

ধর্ম্মোক্ত সকল ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান বারমাস তাঁহার গৃহে হইত; আজিও হইয়া থাকে। মহারাণীর মাতা অদ্যাপি জীবিতা আছেন। যে সকল রমণীয় গুণ তাঁহার চরিত্রের ভূষণ, সচরাচর একাধারে তাহাপ্রায় দেখা যায় না। পিতা মাতার সাধুজীবনের দৃষ্টান্ত কেমন কার্য্যকর, তাঁহাদের পবিত্রতা, তাঁহাদের মহত্ব, তাঁহাদের ধর্ম্মভাব, সন্তানে কতদূর বিকশিত হইতে পারে, মহারাণী শরৎসুন্দরী তাহার উজ্জ্বলতম প্রমাণ।

অতি অল্প বয়সে মহারাণীর বিবাহ হয়। তাঁহার বয়স তখন ছয়-বৎসর; স্বামী স্বর্গীয় রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ তখন দ্বাদশবর্ষীয় বালক-মাত্র।* গল্প শুনা যায়, বিবাহের পূর্ব্বে একজন গণক মহারাণীর বৈধব্য গণনা করিয়াছিল। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে তাঁহার বৈধব্য ঘটে। পিতা-মহী গণকের গণনা ব্যর্থ করিবার উদ্দেশে স্থির করিয়াছিলেন, বেশী বয়সে পৌত্রীর বিবাহ দিবেন। বলা বাহুল্য তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। পরিণত হইলে বুঝি বঙ্গসমাজ মহারাণী শরৎসুন্দরীর নাম কখন শুনিতে পাইত না। যাহা হউক, কিন্তু তাহাহইলে বুঝি দেবী শরৎসুন্দরী জীবনে সুখী হইতে পারিতেন। পবিত্রতাময়ী মহা-রাণী শরৎসুন্দরীর গার্হ্যস্থজীবন কেবল দুঃখময়। বাল্যে বিধবা, যৌবনে পিতৃহীনা, হায়! জীবনের সকল ভাগই তাঁহার কেবল দুঃখময়। চিরদুঃখিনী সীতার চিত্র মনে করিয়া যে জাতি অনুদিন পবিত্রতার অশ্রুবিসর্জ্জন করেন, সাধ্বী শরৎসুন্দরীর দুঃখযন্ত্রণাময় জীবনের ইতি-হাস বাস্তবিক সে জাতির অর্চ্চনার সামগ্রী।

১২৭২ সালে শরৎসুন্দরীর হস্তে বিষয়ভার অর্পিত হয়। সেই অবধি কিরূপ প্রশংসা এবং দক্ষতার সহিত তিনি উহা চালাইয়া আসিয়াছেন, এখানে তাঁহার পরিচয় দিতে হইবে না। গতবৎসর

* বয়স গণনায় ভুল হইয়াছে। বিবাহকালে রাজার বয়স ১৫শ বর্ষ।

হইতে তাঁহার কাশীবাসের কথা হইতেছে। সেই অবধি তিনি ইদানীন্তন বিষয় কার্য্যে অনেকটা হতাদর হইয়াছিলেন।

দীল্লির দরবারের সময় শরৎসুন্দরী "মহারাণী" উপাধি লাভ করেন, কিন্তু তিনি খেলাত গ্রহণ করেন নাই। গবর্ণমেণ্টকে সেই উপলক্ষে জানাইয়াছিলেন, তিনি বিধবা, সে সম্মান তাঁহার গ্রহণীয় নহে। মহারাণীর দান এত বিস্তৃত এবং তাহা সাধারণে এত পরিচিত যে তাহার উল্লেখ মাত্রই এখানে যথেষ্ট। কিন্তু তিনি অতি গোপনে নিজের আমলাদেরও অজ্ঞাতে যে সকল দান করেন, আজিকার এই বাহ্যাড়ম্বরের দিনে তাহার কিছু পরিচয় দিতে হইতেছে। আজি পর্য্যন্ত প্রায় ৪।৫ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিবার কিছু পরে বৈষয়িক কাগজ পত্র দেখা এবং সংবাদপত্র পাঠ করা তাঁহার একটী দৈনিক নির্দ্দিষ্ট কার্য্য। সেই সময় পরিচিত দুঃখী স্ত্রীলোক, বালক এবং বালিকাদল আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া বসে; কেহ কাঁদিতেছে, ঘরে খাবার নাই, কাহারও কাপড় নাই, কাহারও ছেলের ব্যারাম, চিকিৎসা হয় না। সকলেই দুঃখের কান্না কাঁদিতেছে, শুনিতে শুনিতে মহারাণী চক্ষের জল মুছিতেছেন। সকলেরই অভাব মোচন করিতে হইবে, কাহাকেও বিমুখ করা হইবে না। রাজবাটীতে অবশ্য চিকিৎসকের অভাব নাই, ইঙ্গিত মাত্রেই দুঃখিনীর ছেলেটীর চিকিৎসা হইতে পারে। কিন্তু মহারাণী অতি গোপনে তাহার হস্তে উপযুক্ত অর্থ দিয়া ডাক্তার আনাইয়া চিকিৎসা করাইতে উপদেশ করেন।

কোমল বয়সে স্বামীর যত্নে মহারাণী সামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তাহার পর নিজের যত্ন ও অধ্যবসায়ের গুণে সেই শিক্ষা বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তাঁহার নিজের একটী লাইব্রেরী আছে। এদেশে যে কোন সুশিক্ষিতের পক্ষে সেইরূপ পুস্তকরাশির সংগ্রহ

সুখ্যাতির কথা। গতবৎসর পর্য্যন্ত মহারাণী প্রায় সকল বাঙ্গলা সাময়িক পত্র গ্রহণ ও পাঠ করিতেন। অনেক বাঙ্গলা গ্রন্থকার তাঁহার উৎসাহ ও অর্থানুকুল্য লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়সমূহ, তাঁহার সাহায্যাধীন বিদ্যার্থী নিরাশ্রয় ভদ্রসন্তানগণ তাঁহার বিদ্যোৎসাহিতার প্রমাণ। সেই সব ভদ্রসন্তানের প্রতি তাঁহার স্নেহ এবং যত্ন মনে করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। রাজসাহী কলেজের সুন্দর গৃহগুলি, রেইল প্রভৃতি তাঁহাদের দুই স্ত্রী পুরুষের অক্ষয়কীর্ত্তি। অন্তঃপুরে বসিয়াও ভারতবর্ষের উন্নতির সূচনামাত্রে তাঁহার মনে কেমন আনন্দ, কেমন উৎসাহ জন্মে, আত্মশাসনপ্রণালী উপলক্ষে গতবৎসর পুঠিয়ার বিরাটসভা তাহার উদাহরণ। সেই সভার পর্দ্দার অন্তরালে মহারাণী স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। বোধ হয় অনেকেই জানেন যে আত্মশাসন সম্পর্কে এদেশে সেই প্রথম সভা।

মহারাণী শরৎসুন্দরী হিন্দুধর্ম্মে অনন্ত বিশ্বাসবতী। তাঁহার জীবন হিন্দুধর্ম্মময় ,—হিন্দুশাস্ত্রের সকল অনুশাসন তিনি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। বাল-বিধবা সেই আবাল্য ।যথাশাস্ত্র ব্রহ্মচর্য্য-অবলম্বন করিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়া আসিতেছেন। এই কঠোর ধর্ম্মভাবের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য চিরদিনের মত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সেবার গঙ্গাসাগর হইতে ফিরিয়া কলিকাতায় প্রাণসংশয়রূপে পীড়িতা হন। সেই অবধিই প্রায় অসুস্থ। কিন্তু অসুখের কথা সহজে কেহ জানিতে পারে না। সর্ব্বদা অনাবৃত হর্ম্ম্যতলে বসিয়া থাকা তাঁহার নিয়ম। পীড়ার কষ্ট অসহ্য না হইলে আর শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন না। সুতরাং পীড়া গুরুতর হইয়া না দাঁড়াইলে কখন তাঁহার চিকিৎসা হইতে পায় না। নিরাশ্রয়া বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যা সংখ্যায় অনেকগুলি বারমাস তাঁহার আশ্রয়ে রাজান্তঃপুরে বাস করেন। অনেক সময়

তাঁহারা মহারাণীকে ঘেরিয়া বসেন ও নানা গল্প করেন। রাত্রে প্রকাণ্ড চাতালে সকলের মধ্যস্থলে সামান্য শয্যায় শয়ন করেন, পালঙ্ক নাই, ইস্প্রিংয়ের গদী নাই, দুগ্ধ-ফেন-নিভ শয্যা নাই, মে'জের উপর সেই সামান্য শয্যাতেই মহারাণী সন্তুষ্ট।

এক্ষণে কিছুদিন মধ্যে মহারাণী বোধ হয় কাশীবাস করিবেন। তিনি যেখানেই থাকুন, সমগ্র ভারতবাসীরও প্রীতি তাঁহার সহগামিনী হইবে।" বঙ্গবাসী ১২৯০ সাল ১৬ই বৈশাখ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মহারাণীর স্বকর্ত্তৃত্ব সময়ের কার্য্যসমালোচনা, পুত্রের হস্তে সম্পত্তির ভার অর্পণ, পুত্রের মৃত্যু, পুনরায় সম্পত্তির ভার গ্রহণ, নানা তীর্থভ্রমণ, কতিপয় কার্য্যালোচনা, কলেবর ত্যাগ।

মহরাণী শরৎ সুন্দরী, অসাধারণ দান-ধর্ম্মশীলা হইলেও তাঁহার রক্ষণাধীন সম্পত্তির তত্ত্বাবধান কার্য্য, অতি নিপুণতার সহিত করিয়াছেন। তিনি ১২৭২ বঙ্গাব্দে সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া ১২৯০ বঙ্গাব্দে বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রের হস্তে প্রত্যর্পণ করেন। এই আঠার বৎসরের মধ্যে সমস্ত সম্পত্তির উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। নানা উপায়ে প্রায় লক্ষাধিক টাকা বার্ষিক আয় বৃদ্ধি এবং ন্যূনাধিক দশলক্ষ টাকা

মূল্যের সম্পত্তি ক্রয় করিয়া ছিলেন। তিনি, সম্পত্তির ভার গ্রহণ সময়ে প্রবল ওয়াটসন্ কোম্পানী প্রভৃতির সহিত বিস্তর বিবাদ বিসম্বাদ ছিল। ক্রমে ক্রমে সেই গুলি সন্ধি দ্বারা এবং আদালতের আশ্রয়ে মীমাংসা করিয়া রাম রাজ্যের ন্যায় প্রজাপালন করিয়াছিলেন। অথচ প্রজাগণ সন্তুষ্ট হইয়া ইচ্ছা পূর্ব্বক বৃদ্ধি হারে জমা দিতে বাধ্য হইয়াছিল। স্বহস্তে ভার গ্রহণকালে সম্পত্তির যে পরিমাণ লাভ ছিল, আঠার বৎসর পর পুত্রের হাতে সম্পত্তি প্রত্যর্পণ কালে, খরিদা সম্পত্তি সহ প্রায় দ্বিগুণিত আয় বৃদ্ধি হইয়াছিল। ১২৮১ বঙ্গাব্দের দুর্ভিক্ষে মহারাণী প্রজাদিগকে মাতার ন্যায় আহার যোগাইয়া ছিলেন, এবং ন্যায্য খাজনার মধ্যে বিস্তর টাকা মাপ দিয়াছিলেন। তবে তাঁহার অসাধারণ দানশীলতায় সম্পত্তিক্রয়ে যোজিত-অর্থ ব্যতীত, সঞ্চয় কিছুই থাকিত না। বরং কিছু টাকা ঋণ হইয়াছিল। ফলতঃ সে সময়ে ডিক্রী ইত্যাদিতে যে পরিমাণ প্রাপ্য ছিল, তাহার তুলনায় ঋণ, অতি সামান্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি প্রজাদিগের বিদ্যা শিক্ষা, পীড়িতের চিকিৎসা, কৃষি বাণিজ্যাদির উন্নতি, জল কষ্ট ও পথের কষ্ট নিবারণ নিমিত্ত প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন।

তাঁহার দত্তক পুত্র, কুমার যতীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর, তাঁহাকে অসাধারণ ভক্তি করিতেন। মহারাণী তীর্থবাস নিমিত্ত বহু পূর্ব্ব হইতে অভিলাষিণী থাকিলেও, কুমারের বয়ঃ প্রাপ্ত কাল প্রতীক্ষায় তাহা করিতে পারেন নাই। ১২৯০ বঙ্গাব্দে কুমার প্রাপ্ত বয়স্ক হইলে, মহারাণী, সম্পত্তি তাঁহার হস্তে অর্পণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু, মাতৃভক্ত কুমার, কিছুতেই সম্পত্তির ভার গ্রহণে সম্মত কিম্বা মাতৃ-সন্নিধান ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। অন্য বিষয় মুগ্ধা সুখাভি-লাষিণী মহিলা হইলে কুমারের প্রস্তাবেই অনুমোদন করিতেন, কিন্তু

জগতের আদর্শ সতী সংসার-বিরক্তা ধর্ম্মপ্রাণা শরৎসুন্দরী, আপনার হস্তে সম্পত্তি রাখিতে কিছুতেই ইচ্ছা করিলেন না। পুত্রকে নানা প্রকারে বুঝাইয়া তাঁহার হস্তে সম্পত্তির ভার প্রদান করিলেন। কুমার কেবল মাতৃ আজ্ঞা পালনার্থ, নামে মাত্র সম্পত্তির ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি সামান্য কার্য্যও মাতার অনুমতি ব্যতীত সম্পাদন করিতেন না। মহারাণী শরৎসুন্দরী, পুত্রের হস্তে সম্পত্তির ভার দিয়া কাশী যাত্রা মনন করিলেন।

তিনি, বিধবা হইয়া অবধি ধর্ম্মকার্য্য ব্যতীত আপনার শরীরের প্রতি অনুমাত্রও দৃষ্টিপাত করেন নাই। বরং ব্রত উপবাসে শরীরকে ক্ষীণ করিবার জন্য নিয়তই চেষ্টা করিতেন। অতএব, ক্রমে ক্রমে নানা প্রকার ব্যাধিতে আক্রান্তা হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার কার্য্য প্রণালীর কিয়ৎ পরিমাণ আলোচনা করা যাইতেছে।

এই সংসাররূপ মহাশ্মশানে ধার্ম্মিকদিগের দেহ, জীবন থাকিতেও মৃত প্রায়। বিষয়ী লোক হইতে তাঁহাদের চরিত্র এবং কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ পৃথক্। বিষয়মুগ্ধ ব্যক্তিগণ, আপনার অনিত্য শরীর লইয়াই ব্যস্ত; শরীরের সুখ, শরীরের সৌন্দর্য্য,—শরীরের যত্নেই দিন যাপন করে। আর ধার্ম্মিকেরা জগৎকে নশ্বর ভাবাপন্ন জানিয়া আপনার দেহকে পঞ্চ মহাভূতের সমষ্টি জড় মাত্র দেখিয়া আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা, সংসারের কোলাহলের মধ্যে থাকিয়াও নীরব ও নিস্পন্দ। সংসারের সমস্ত কর্ম্মই করিতেছেন, অথচ তাঁহারা এরূপ নির্লিপ্ত, যেন তাঁহাদের সঙ্গে সংসারের কোন সম্পর্কই নাই। অন্যেরা তাঁহাদিগকে পৃথক্ জীব বলিয়া বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগের হৃদয়ের গভীর মহত্ত্বকে, আপন আপন স্বার্থ সাধনের সদুপায় বলিয়া স্থির করে। কেননা ধার্ম্মিকের নিকট নশ্বর অর্থ, লোষ্ট্রের ন্যায়

অকিঞ্চিৎকর। আর সংসারী, অর্থকেই প্রাণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম ভাবিয়া থাকে। পৃথিবীতে ইহার কোটি কোটি দৃষ্টান্ত সকলেরই প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে।

ধার্ম্মিকেরা অর্থ ত্যাগ করিয়া সুখী, আর সংসারীরা অর্থ অর্জ্জন করিয়াই আনন্দিত হইয়া থাকে। ইহাতেই সংসারের মায়াময় চক্ষে ধার্ম্মিকের দেহ মৃতবৎ প্রতীয়মান হয়। তাহাতেই সংসার বিরক্ত যোগী দেখিলে, সংসারী তাঁহার নিকট শরীর রক্ষার্থে মন্ত্রৌষধ আর ঐশ্বর্য্য কামনায় তাঁহাকে উত্ত্যক্ত করিয়া থাকে। স্বার্থশীল পিশাচেরা সেই দেহের চতুর্দ্দিকে বিকট হাস্যে নৃত্য করিয়া থাকে। আত্মীয় শ্ব-গণেরা (কুক্কুরেরা) তাঁহার দেহের মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া লইতে ব্যগ্র হয়। লোভী শৃগালেরা অহো রাত্রি, মাংস লোভে ঘিরিয়া থাকে। অর্থী শকুণীরা দলে দলে দূর দূরান্তর হইতে সেই দেহের ঘ্রাণে আসিয়া থাকে। সময় নাই, অসময় নাই, ধার্ম্মিকের চারিদিকে পিশাচের নৃত্য, কুক্কুরের বিকট শব্দ, শৃগালের রোল, গৃধিণীর পক্ষ নির্দ্ধূনন সর্ব্বদাই আছে। কিন্তু, তাঁহার নিকট এমন এক জনও নাই, যে ব্যক্তি তাঁহার মহত্ব লাভে লোলুপ ; অথবা এরূপ একটী জীব নাই, যে তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রের আদর্শ লইতে ইচ্ছুক। অর্থীদিগের প্রত্যেকের চরিত্র এবং বুদ্ধি বিভিন্ন হইলেও, আশা আর উদ্দেশ্য এক।

বরং ইহারাও কতক ভাল। কিন্তু সংসারে যে একদল*পিশাচ আছে, তাহারা ধার্ম্মিকের দেহের মাংসে আকণ্ঠ পূর্ণ করিতেছে,—শোণিতে আবক্ষ প্লাবিত করিতেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তাহাতেও শান্তি নাই,—তথাপি আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নাই। তাহাদের হৃদয়ে এই যাতনা হয় যে, তাহারা যেরূপ পৈশাচিক চরিত্র, ধার্ম্মিকেরাও কেন তাহাই হইল না।—তাহাদের পাপে তাহাদের কলঙ্কে জগৎ যেরূপ

কলুষিত, ধার্ম্মিকেরা কেন তাহাই হয় না। তাহারা সেই অশান্তির হিংসানলে দগ্ধ হইয়া থাকে। আর সেই জন্যই দুরাত্মারা আপনার দেহের নবদ্বার দিয়া অহরহঃ ধার্ম্মিকের কলঙ্ক-ধূম নির্গত করিয়া থাকে। কিন্তু, চরাচর জগৎ তাহা লক্ষ্যও করেনা। বরং সকলেই প্রত্যক্ষ করে যে, পিশাচদিগের সেই কলঙ্ক-ধূমে কিম্বা তাহার পূতিগন্ধে ধার্ম্মিকের দেহের কিছুই অনিষ্ট করিতে পারেনা। পক্ষান্তরে তদ্দ্বারা তাহারাই দগ্ধ হইয়া থাকে। ধার্ম্মিকের আত্মা, পৃথিবীর অনেক ঊর্দ্ধে অবস্থিত। পিশাচগণ, তাঁহার পার্থিব দেহ আক্রমণে সাহসী হইলেও তাঁহার সুপবিত্র হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে না।

মহা তপস্বিনী, মহারাণী শরৎসুন্দরী, সেইরূপ পবিত্রহৃদয়া অনন্য সাধারণ, মহিলাকুলের শিরোমণি ছিলেন। তিনি, দেহকে একটা পদার্থ বলিয়াই জানিতেন না। বিধবা হইয়া অবধি তিনি আপনার দেহকে মৃত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। সুতরাং বিধবা হইবার মুহূর্ত্ত হইতে সেই অকিঞ্চিৎকর মৃত প্রায় দেহ, ধর্ম্মকার্য্যে উৎসর্গ করিয়া ছিলেন। তাঁহার আপনার শরীরের প্রতি যত্ন মমতা কিছুই ছিল না। সেই মৃত প্রায় দেহ, যেন কেবল পিশাচ, কুক্কুর, শৃগাল, গৃধিণীগণের স্বার্থ চরিতার্থের জন্যই ছিল। তাহারা সেই নিমিত্ত তাঁহার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ব্যাধি, শোক, দুঃখ কিছুই অনুভব না করিয়া আপনার স্বার্থের কারণ যখন তখন বিরক্ত করিত। কিন্তু লোকললাম-ভূতা স্বর্গীয়া দেবী শরৎসুন্দরীর জ্ঞানের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! মহত্ত্বের কি অনির্ব্বচনীয় শক্তি!—আত্মোৎসর্গের কি নিরুপমা মধুরিমা! তিনি, সেই শৃগাল কুক্কুরের জন্য, অকপট চিত্তে আত্মদেহ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। অর্থীর প্রার্থনা শুনিতে স্নান, আহার, শয়ন উপবেশন, কিম্বা ব্যাধির ক্লেশ যেন কিছুই লক্ষ্য করিতেন না। তিনি ক্ষুধাতুরকে আহার দিলেই

নিজে পরিতোষ লাভ করিতেন। প্রার্থীর অভাব পূর্ণ করিলেই আপনার প্রভূত শান্তি অনুভব করিতেন। পীড়িতের পীড়া শান্তি করিলেই আপনাকে সুস্থ দেহা বিবেচনা করিতেন। তাঁহার সর্ব্বদা এই অনুসন্ধান ছিল যে, কোন্ দুঃখী অনাহারে আছে; কাহার গৃহে অদ্য তণ্ডুল নাই; কে অর্থাভাবে বিদ্যাভ্যাস করিতে পারিতেছে না; কোন্ রোগী দরিদ্রতায় চিকিৎসার ব্যয় দিতে অসমর্থ; কোন্ ব্যক্তি প্রিয় পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে অসমর্থ হইয়াছে। তিনি গৃহাগত শত শত অনাথাকে আপনার পরিবারের মধ্যে লইয়া পূজনীয়া জননীর মত তাঁহাদিগের সঙ্গে একত্রে সংসার করিতেন। সূর্য্যোদয় অবধি, রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত, তাঁহার গৃহ রন্ধন-ধূমে পরিব্যাপ্ত থাকিত। সর্ব্বদাই, নানা উপাদেয় সামগ্রী প্রস্তুত হইতেছে; ভারে ভারে সন্দেশ, দধি, ক্ষীর ইত্যাদি আসিতেছে, তাহা মহারাণীর নিজের জন্য কিছুই নহে। ব্রতোপবাসেই তাঁহার অধিক দিন গত হইত, মাসের মধ্যে যে অল্পদিন আহার করিতেন, তাহাও সামান্য হবিষ্যান্ন। দুগ্ধ ব্যতীত ছানা, ক্ষীর মাখন তিনি স্পর্শও করিতেন না। তিনি প্রত্যহ বিস্তর বিচিত্র বস্ত্র, শাল বনাত বিতরণ করিতেন, কিন্তু আপনি একখানি মোটা কাপড়েই শীত গ্রীষ্ম অতিবাহিত করিতেন। তিনি, পৌষ মাঘ মাসের দুরন্ত শীতেও পরিধেয় বস্ত্রের অঞ্চল বেষ্টনেই শীত নিবারণ করিতেন। শীতের রাত্রিতে কম্বলাদি ব্যবহার করিতেন। তিনি এতাদৃশ কোমল হৃদয়া ছিলেন, যে, পর দুঃখ দেখিলেই অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে দ্রবীভূত প্রায় হইয়া যাইতেন। তাঁহার আপনার অভাবের সীমা ছিলনা, কিন্তু অন্যের অভাব, অন্যের কষ্ট দেখিলে আত্মহারা হইতেন।

তিনি ঘোরতর পাপাত্মাকেও নিন্দা করিতেন না, কাহার নিন্দা

শুনিলে বক্তাকে সবিনয়ে নিষেধ করিতেন। অতি পাপাত্মাও দুঃখে পড়িয়া তাঁহার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা চাহিলে তিনি অম্লান চিত্তে তাহাকে দয়া করিতেন। তবে কেহ অন্যের সঙ্গে মোকদ্দমা করিতে কিম্বা পাপাত্মাগণ, পাপ হইতে নিবৃত্তি না হইলে তাহাদিগকে কিছু দিতেন না। তাঁহার স্বভাবের আর একটী অনির্ব্বচনীয় ধর্ম্ম ছিল যে, তাঁহার মতের বিরুদ্ধে অতি সামান্য লোক বক্তা হইলেও, প্রতিবাদ করিয়া তাহার মনে ব্যথা দিতেন না। তিনি প্রকৃত দরিদ্রের অযাচিত ভাবে দুঃখ মোচন করিতেন। অথচ, বিধবা হইবার দিন হইতে তিনি, রজত, কাঞ্চন, মণি, মুক্তা কিম্বা টাকা মোহর কিছুই স্পর্শ করিতেন না। স্বর্ণ-রৌপ্যাদি উৎসর্গ কালে কুশাগ্রদ্বারা স্পর্শ ব্যতীত তৎসমুদায়ে হস্ত সংলগ্ন করিতেন না। কেহ তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন যে, "অর্থই সমস্ত অনর্থের হেতু, অর্থ স্পর্শ করিলেই তাহাতে মমত্ব এবং লোভ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।" বাস্তবিক পক্ষে তিনি কর্ম্ম-সন্ন্যাসিনী ছিলেন। অকামে যথাশক্তি কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে অনুমাত্রও ত্রুটি করেন নাই। তিনি সর্ব্বদা মৃত্তিকাসনে উপবেশন করিতেন, আসন ব্যবহার করিতে হইলে কুশাসন ভিন্ন অন্য আসন ব্যবহার করিতেন না। শরীর মলদিগ্ধ থাকিলেও,তাঁহার যোগক্ষম দেহ, পবিত্র সতীত্ব এবং তপস্যার জ্যোতিতে পূর্ণ ছিল।

তিনি অযাচিতরূপে শত শত দুঃখীর প্রার্থনা পূর্ণ করিতেন। আতিথ্যে তাঁহার পাত্রাপাত্র কিম্বা কালাকাল ছিল না। ধনী হইতে দিনহীন দরিদ্র পর্য্যন্ত, সকলকে তুল্যরূপে উপাদেয় সামগ্রীতে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করাইতেন। তাঁহার নিঃস্বার্থ দানের সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত থাকিলেও এস্থানে কতিপয় দৃষ্টান্ত মাত্র উল্লেখ করা যাইতেছে।

একবার মহারাণী দোতালার উপর হইতে দেখিলেন যে, নয় কি দশ

বৎসর বয়স্ক দুইটী বালক, অতি মলিন বেশে রাজপথের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া আছে। তাহাদের আকৃতি, বেশ, এবং অবস্থা দেখিয়া তিনি, বালকদ্বয়কে অনন্যসহায় দূরদেশবাসী বলিয়া স্থির করিয়া এক জন দাসীকে তাহাদিগের সন্ধান জন্য প্রেরণ করিলেন। দাসী, সন্ধান জানিয়া বালকদ্বয়ের অবস্থা এইরূপ জানাইল যে, তাহাদের বাড়ী সুদূর পূর্ব্ব দেশে। তাহাদিগের নিজের অবস্থা তত ভাল নহে যে, আশানুরূপ বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারে, সেই কারণ দুইজনে বিদ্যা পিপাসু হইয়া বাড়ীতে না বলিয়া বহুদেশ পর্য্যটন করিতে করিতে এখানে আসিয়াছে। দয়াময়ী মহারাণী তখনই তাহাদিগের অবস্থিতির স্থান নির্দ্দেশ এবং আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাহার পরে তাহাদিগের দুই জনের ইচ্ছামত পাঠ সমাপ্তি পর্য্যন্ত, পাঠের এবং ভরণপোষণের সমস্ত ব্যয় দিয়া তাহাদিগকে চরিতার্থ করিয়াছিলেন। *

কলিকাতা বাদুড়বাগান নিবাসী * * * কাঙ্গীলাল নামক এক ব্যক্তি, উত্তর বঙ্গ রেলওয়েতে কার্য্য করিতেন। তিনি কোন অপরাধে কারাবদ্ধ হইয়া এককালে নিঃস্ব হইয়াছিলেন। রাজসাহীর জেল হইতে মুক্ত হইবার সময়, তিনি শারীরিক অত্যন্ত পীড়িত হইয়া সামান্য কিছু ভিক্ষা লাভ নিমিত্ত বহু কষ্টে মহারাণীর কাছারীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহারাণী, লোক মুখে তাঁহার দুরবস্থার বিষয় অবগত হইয়া দুই মাস কাল চিকিৎসা করাইয়া আরোগ্য হইলে নগদ চারিশত টাকা দিয়া বিদায় করিয়াছিলেন।

অন্য একজন রেলওয়ের কর্ম্মচারীকেও কারাভোগের পর দুইশত টাকা দিয়া নানারূপে সান্ত্বনা করিয়া বিদায় করিয়াছিলেন।

---

* ইহাঁদের একজন বি, এ, পাশ, করিয়া শিক্ষকতা করিতেছেন এবং অন্য জন চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন হইয়াছেন।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, দানকালে কর্ম্মচারীগণ, অনেক সময়েই নাবালকের সম্পত্তি বলিয়া বাধা দিতেন! মহারাণী, অনেক সময়ে আপনার বুদ্ধি কৌশলে প্রকারান্তরে সেই কর্ত্তব্য সাবধানে সংসাধন করিতেন। তাঁহার পুরোহিত বংশীয় একটী বালককে তিনি, আপনার ব্যয়ে বিক্রমপুর এবং নবদ্বীপে শাস্ত্রাধ্যয়ন করাইয়া কৃতবিদ্য করিয়াছেন। সেই বালক কৃতবিদ্য হইয়া পুঠিয়া রাজধানীতে অবস্থিতি কালে, মহারাণী জানিলেন যে, দুর্ব্বহ তিন হাজার টাকা ঋণের জন্য পুরোহিত-বালক সর্ব্বদাই ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকেন। একত্রে এই তিন হাজার টাকা দানে কর্ম্মচারিগণ, কিছুতেই সম্মত হইবেন না; আর মহারাণী, অন্য প্রকারে এই টাকা প্রদান করিলেও, অন্য পুরোহিতগণ, মনঃকষ্ট পাইতে পারেন। অথচ তিনি, সকলকেই সমান চক্ষে দেখিয়া থাকেন। অন্যের এরূপ ঋণ নাই যে, সকলকেই সমান উপায়ে সন্তুষ্ট করিতে পারেন। শেষে তিনি, চিন্তা করিয়া ঋণী পুরোহিত পুত্রকে তিন হাজার টাকা ঋণ দিয়া ক্রমশঃ লইবার জন্য কর্ম্মচারীদিগের নিকট প্রস্তাব করিলেন। কর্ম্মচারীরা এতদ্দ্বারা প্রত্যক্ষে কোনও রূপ ক্ষতি প্রদর্শন করিতে অশক্ত হইয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিছু দিন পর তিনি একটী চতুষ্পাঠী স্থাপন উপলক্ষে সেই পুরোহিতকে মাসিক চল্লিশ টাকা বৃত্তি অবধারণ করিয়া এবং আর কিছু দিন পরে একটী অতিরিক্ত স্বস্ত্যয়ন উপলক্ষে মাসিক কুড়ি টাকা বন্ধান করিয়া দিলেন। তাহার পরে অন্যান্য উপলক্ষেও কিছু কিছু দিয়া অল্প দিনের মধ্যে সেই তিন হাজার টাকা ঋণ হইতে পুরোহিত সন্তানকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

তিনি যে আঠার বৎসর কাল স্বহস্তে সম্পত্তি রাখিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে কোনও চাকর বিশেষ, অপরাধ করিলেও, তাহাকে কর্ম্ম হইতে অবসর করেন নাই। তাঁহার তেজস্বিনী মূর্ত্তি, আর

নিরূপম দয়াই সকলের চরিত্রশোধক শাসন-দণ্ডরূপে প্রতীয়মান হইত। ভৃত্যগণ, এই ধর্ম্মময়ী দেবীর কোনও প্রকার অনিষ্ট করিতে মহা আতঙ্কগ্রস্ত হইত; তাহার পর, তাঁহার অপার করুণা হইতে বঞ্চিত হইবে বলিয়া ভয়ে অনেক দুষ্ট লোকও, শোধিত চরিত্রবান্ হইয়াছিল। তাঁহার স্মরণশক্তি নিতান্ত প্রখরা ছিল। প্রত্যহ অপরিচিত শত শত প্রার্থীকে তিনি স্বয়ং না দেখিতে পাইলেও যাহার নাম এবং অবস্থা একবার শুনিতেন, দশ বৎসর পর সে পুনরায় উপস্থিত হইলে তাহার অবস্থা শুনিবামাত্র অনায়াসে চিনিতে পারিতেন। পরিচিত অপরিচিত যে কোনও ব্যক্তিই কেন না হয়, একবার তাঁহার নিকটে কোনও সাহায্য পাইলে, আজীবন তাহার অন্য প্রকারের বিপদ উদ্ধারের কি উন্নতির জন্য, যেন তিনি সর্ব্বথা দায়ী বলিয়া বিবেচনা করিতেন। সে ব্যক্তি সদ্ভাবে থাকিলে, মহারাণী তাহাকে সর্ব্বপ্রকারে চিরদিনই স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার দয়া বিতরণে স্বদেশী বিদেশী, স্বধর্ম্মী বিধর্ম্মী বিচার ছিল না। তিনি দানের জন্য অনেক সময় ঋণ করিতে, এবং ঋণের সুবিধা না হইলে যে পর্য্যন্ত অর্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করিতে না পারিতেন, সে পর্য্যন্ত অনাহারে রোদন করিতেন।

তিনি, কাহারও নিষ্কর ভূমি, জরিপে পরিমাণ অপেক্ষা অতিরিক্ত দৃষ্ট হইলেও বাজেয়াপ্ত করেন নাই। যদি কেহ দলীল দেখাইতে না পারিতেন, তবে তাহার দীর্ঘকাল ভোগাধিকারই উৎকৃষ্ট প্রমাণরূপে গণ্য করিতেন।

একবার তাঁহার কার্য্যকারকেরা একজন ব্রাহ্মণের দলীল না থাকায় দশ বিঘা ব্রহ্মোত্তর বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ বহু চেষ্টাতেও এ বিষয় মহারাণীর গোচর করিতে পারিয়া ছিলেন না। এক দিন মহারাণী পাল্‌কীযোগে পিতৃগৃহে যাইবার সময় পথে সেই ব্রাহ্মণ

উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার মনোবেদনা নিবেদন করিতে লাগিল। তখন মহারাণী পাল্‌কী চলা বন্ধ করিয়া সমস্ত অবস্থা শুনিয়া তাঁহার পিতৃ-ভবন হইতে প্রত্যাগমনকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণকে রাজবাড়ীতে অপেক্ষা করিতে আদেশ দিয়া পিত্রালয়ে গমন করিলেন। কিছুকাল অন্তেই মহারাণী স্বভবনে আসিয়া দরবার গৃহে বসিয়া কর্ম্মচারীদিগের সহ ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া আনাইলেন। সকলে আসিলে মহারণী কর্ম্মচারী-দিগের নিকট অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা স্বকৃতকার্য্য স্থির রাখার জন্য ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে বলিতে ত্রুটি করিলেন না। দয়াময়ী মহারাণী কর্ম্মচারীদিগকে কোনও কথায় নিরস্ত করিতে না পারিয়া কহিলেন যে "এই ব্রাহ্মণের যদিচ কোনও দলীল নাই, এবং দখল ভোগেরও প্রমাণ নাই, কিন্তু কোনও রূপ সম্বন্ধ ব্যতীত ইনি রাজ-ধানীতে একটী বঞ্চনার কার্য্যে সাত আট বৎসর কাঁদিতেন না। অতএব আমি এই দশ বিঘা ভূমি ইহাঁর জীবিকা নিমিত্ত দান করিতে ইচ্ছা করি। আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, আমি এই সম্পত্তি, এই অট্টালিকা থাকিতেও চির দুঃখিনী। আর আমার সমস্ত সম্পত্তি, কেবল আমাকে "মা" বলিয়া ডাকে বলিয়া একজন ব্রাহ্মণ সন্তানকে (অর্থাৎ দত্তক পুত্রকে) দিতে পারিয়াছি। এ ব্রাহ্মণও পুত্রের ন্যায় আমার নিকট সামান্য কিছু জীবিকার জন্য প্রার্থনা করিতেছে, সে স্থলে দশ বিঘা ভূমি দান অতি সামান্য। আমার দত্তক যে, ইহার পর এই সামান্য ভূমি হইতে ইহাঁকে বঞ্চিত করিবে এরূপ বিশ্বাস করি না।" কর্ম্মচারীগণ নিরুত্তর হইলেন, এবং ভূমি দানের অনুমোদন করিলেন। ব্রাহ্মণ মা মা বলিতে বলিতে পরমানন্দে গৃহ গমন করিলেন।

মহারাণী গুরুতর অপরাধীর বিরুদ্ধেও ফৌজদারী করিতে অনুমতি

দিতেন না। কার্য্যকারকগণ, তাঁহার অজ্ঞাতে কাহারও বিরুদ্ধে ফৌজদারীতে নালীস করিলেও, তিনি জ্ঞাত হইবামাত্র প্রতিবাদীকে সাধ্যমত রক্ষা করিতেন।

তাঁহার পতির আমলের একজন চতুর মোক্তার, কিছুদিনের জন্য তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত হইয়া নিরপেক্ষ ভাবে সম্পত্তি শাসন আরম্ভ করিলেন। মহারাণীর মৃদু ব্যবহারে অনেক কর্ম্মচারীই প্রশ্রয় পাইয়াছিল। কিন্তু এখন, মোক্তারের নিরপক্ষপাত কার্য্য তাঁহাদের বড়ই বিরক্তিকর হইয়া উঠিল। অবশেষে সকলে গুপ্ত পরামর্শ করিয়া মোক্তারের পূর্ব্ব পদের আয় ব্যয়ের, নিকাশের জন্য মহারাণীর নিকট প্রার্থনা জানাইল। তিনিও তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। মোক্তার যদিচ এখন প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা হইয়া ন্যায়বাদী হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ব পদের কার্য্যে যতদূর সাধ্য মোক্তারী হাত চালাইতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি নিকাশে অন্যান্য বিষয়ে বিস্তর টাকার জন্য দায়ী হইলেন। তাহার মধ্যে বর্ষে বর্ষে কোম্পানীর কাগজের সুদ যাহা রাজসাহী কালেক্টরি হইতে লইতেন, তাহার অনেক টাকা হিসাবে জমা দিয়াছিলেন না। অন্যান্য কর্ম্মচারীগণ, মোক্তারের বিশ্বাসঘাতকতা প্রমাণের এই সুযোগ পাইয়া যে যে তারিখে সুদ খরচ পড়িয়াছে, কালেক্টরী হইতে সেই সেই তারিখের খরচ বহির জাবেদা নকল লইবার দরখাস্ত করিলেন।

মোক্তার অতি সুচতুর, তিনি অন্যান্য কর্ম্মচারীর অভিসন্ধি বুঝিয়াই কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আপনার বিপদ উদ্ধারের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। পরে প্রকাশ হইল যে, কালেক্টরির সেই সেই সময়ের খরচ বহি অনুসন্ধানে পাওয়া যাইতেছে না। কালেক্টর সাহেব এই ঘটনা জ্ঞাত হইয়া বহি বাহির জন্য কর্ম্মচারীদিগের প্রতি বিশেষ শাসন আরম্ভ করিলেন।

কিছুদিন পরে বহি বাহির হইল, কিন্তু যে যে তারিখে, মোক্তারের মারফত মহারাণীর নামে কোম্পানীর কাগজের সুদ খরচ পড়িয়াছে, সেই সেই তারিখের পাতা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কালেক্টর মিঃ হিলি সাহেব তজ্জন্য অনেকগুলি কর্ম্মচারীকে কর্ম্ম হইতে অবসর করিয়া মোক্তারের চক্রান্তে যে এইরূপ হইয়াছে, তাহাই বিশ্বাস করিলেন। এবং তিনি মহারাণীর কর্ম্মচারীদিগের সাহায্যে মোক্তারকে প্রতিবাদী করিয়া মাজিষ্ট্রেটস্বরূপে তদন্ত পূর্ব্বক মোক্তারকে সেশন আদালতের বিচারার্থ অর্পণ করেন। এই মোকদ্দমার সময় মোক্তার, নির্দ্দোষ-চরিত্রা মহারাণীর নানারূপ নিন্দা করিতে লাগিল। কিন্তু বিস্তর কর্ম্মচারী মোক্তারের বিরুদ্ধাচারী হইলেও, এবং মোক্তার শরণাপন্ন হওয়া দূরের কথা, তাঁহাকে নানা প্রকার কটু কথা বলিলেও, দয়াময়ী মহারাণী শরৎসুন্দরী, সকল বাধা বিপত্তির মধ্যে একাকী মোক্তারকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্তা হইলেন। তাঁহার সেই দৃঢ় অধ্যবসায় দেখিয়া মোক্তারের বিরুদ্ধাচারী, কর্ম্মচারীগণও অগত্যা বৈরনির্য্যাতনে ক্ষান্ত হইল। মহারাণী, সে মোকদ্দমায় তদ্বির না করিয়া দোষী মোক্তারকেও বিপন্মুক্ত করিয়াছিলেন।

সনাতন আর্য্যধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কার্য্যও অকামধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইয়া নির্ব্বাহ করিতেন। অথচ সকল কার্য্যের প্রারম্ভেই লক্ষ্য স্থির করিয়া শেষ পর্য্যন্ত অতি ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায়ের সহিত বৈধাচারে সম্পন্ন করিতেন। এই মহৎ গুণ, তাঁহার বাল্যজীবনেই দেখা যাইত। তাঁহার সকল কার্য্যেই সুব্যবস্থা ও প্রকারাভিজ্ঞতার পরিচয় ছিল। এবং ক্ষুদ্র কার্য্যকেও অবহেলা না করিয়া ক্ষুদ্র, বৃহৎ সকল কার্য্যেই তুল্যরূপে যত্নশীলা ছিলেন। তৎকাল প্রচলিত মহিলাসুলভ শিল্পেও তাঁহার বিশেষ

দক্ষতা ছিল। তবে বিধবা হইয়া অবধি কেবল দেব বিগ্রহদিগের নানাপ্রকার পুষ্পাভরণ এবং পুষ্পমালা নির্ম্মাণ ব্যতীত অন্য কোন শিল্পে তিনি হস্তক্ষেপ করিতেন না। তাঁহার রন্ধন পটুতাও সামান্য ছিল না। তবে নিজে কিছু স্থূলাঙ্গী এবং আচার পরায়ণা বলিয়া রন্ধনাদি কার্য্যে কিছু অসুবিধা হইত। তথাপি সময় সময় রন্ধন করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইতেন এবং বারাণসী ক্ষেত্রে বাস কালে প্রত্যহ স্ব-পাকে একটী অথবা দুইটী দণ্ডী ভোজন করাইতেন। কোন সামান্য কার্য্যেও তিনি সাধ্যসত্ত্বে অনুকল্প অনুষ্ঠান কিম্বা অঙ্গহীন রূপে নিষ্পন্ন করিতেন না। ব্রতাঙ্গ উপবাস ও নিয়মাদি স্বয়ং করা ভিন্ন অন্যকে প্রতিনিধি দিতেন না। তিনি জানিতেন যে ব্রতাঙ্গ উপবাসে এবং সংযত আহারে চিত্তসংযম ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহই প্রধান উদ্দেশ্য। যদি ব্রতের দ্বারা, শরীরের অসৎপ্রবৃত্তি সকল দমন এবং সৎপ্রবৃত্তি সকল উন্নত না হইল, তবে ব্রত করায় ফল কি? এই কারণে সময়ে সময়ে শ্রবণা একাদশীর সঙ্গে কোন কোন ব্রতের তিথি একত্র হইয়া তাঁহাকে একাদিক্রমে তিন চারিদিন পর্য্যন্ত নিরম্বু উপবাস করিতে হইত। কোনও সময়, তাঁহার দেহের কান্তি পুষ্টি বৃদ্ধি হইলে, দেহে কি পাপ প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া চিন্তায় অস্থির হইতেন; এবং সংযত আহার দ্বারা শরীর শোষণ করিতেন।

মহারাণী, প্রত্যেক তিথি কৃত্য ব্রত, উপবাস, দেবার্চ্চনা, স্বস্ত্যয়ন, ইত্যাদি, শাস্ত্রদৃষ্ট পদ্ধতিমতে যথাযথরূপে সম্পাদন করিতেন। বাল্য বয়সে পতির চেষ্টায় যে বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন, দুই বৎসরের অধিক কাল শিক্ষকের সাহায্য পাইয়াছিলেন না। অথচ হস্তলিপি তাঁহার আপনার আয়ত্ত ছিল বলিয়া শিক্ষকের "সমানি সমশিরষাণি ঘনানি বিরলানি চ—" এই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া-

ছিলেন; তাহাতেই তাঁহার হস্তাক্ষর ছাপার মত পরিষ্কার এবং সুদৃশ্য হইয়াছিল। তিনি অতিদ্রুত কিম্বা অতি বিলম্বে লিখিতেন না। অথবা চিরন্তন পদ্ধতির প্রতিকূলে আপনার নিতান্ত আত্মীয়া স্ত্রীলোকদিগকে পর্য্যন্ত স্বহস্তে পত্র লিখিতেন না। অথচ পুস্তক বিশেষ হইতে ধর্ম্ম-বিষয়ক কবিতা সকল সংগ্রহ করিয়া স্বহস্তে লিখিতেন। তাঁহার প্রকাণ্ড পুস্তকাগারে স্বহস্তলিখিত একখানি কবিতা পুস্তক অদ্যাপি রক্ষিত আছে। তদ্ভিন্ন সংস্কৃতেও তাঁহার সামান্য বুৎপত্তি ছিল না। তিনি আপনি, ভোগসুখ বর্জ্জিতা চিরদুঃখিনী হইলেও তাঁহার বিনীত স্মিতপূর্ব্ব নম্রভাষায়, ঘোর পাপাত্মাও মন্ত্রমুগ্ধবৎ বশানুবর্ত্তী হইত—পুত্রশোকবিধুরাও শান্তিলাভ করিত।

এক বাড়ীতে তিনজন স্ত্রীলোক একত্র থাকিলে গৃহস্থ জ্বালাতনের একশেষ হইয়া থাকেন, কিন্তু, তিনি নানা চরিত্রা শত শত স্ত্রীলোক লইয়া, তাহাদের নানা যাতনা সহিয়াও অম্লানচিত্তে বাস করিতেন। তিনি দরিদ্রা বয়ঃকনিষ্ঠাকেও সম্মান সূচক কথায় সম্বোধন করিতেন। অতি হীনজাতীয় লোককেও নামগ্রহণে ডাকিতেন না। পুরুষমাত্রকে পিতা অথবা পুত্র এবং স্ত্রীমাত্রকে মাতা অথবা কন্যা সম্বোধনে ডাকিতেন। তাঁহার দেহে কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মাৎসর্য্য, এই পাঁচটী রিপুর প্রভাব এককালে ছিল না। তবে দরিদ্রের দুঃখে মুগ্ধ হইতেন ভিন্ন প্রকৃতপক্ষে মোহেরও প্রাবল্য ছিল না। তিনি কি নীচ, কি ভদ্র, সকলের সহিতই নির্ব্বিশেষ ব্যবহারে সমানরূপে আপ্যায়িত করিতেন। তাঁহার নিকট যে, শত শত সনাথা অনাথা বাস করিত, সর্ব্বদার নিমিত্ত তাহাদের তত্ত্বাবধান করিতেন। তাহার মধ্যে কাহারও পীড়া হইলে জননীর ন্যায় স্বহস্তে সেবা শুশ্রূষা করিতেন। তিনি কাহাকেও কোনও দিবস ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশ করিতেন না,

কিম্বা কাহাকেও ধর্ম্মানুষ্ঠানে বাধ্য করিতেন না। ইহাতেও যদি কেহ ধর্ম্মাচারে প্রবৃত্ত হইত, কিম্বা কোনও ধর্ম্মকার্য্য দেব পূজাদি করিত, তবে তিনি অযাচিতরূপে তাহার বিশেষ সাহায্য করিতেন। তাঁহার অন্নপূর্ণা পূজা এবং জগদ্ধাত্রী পূজার আয়োজন দেখিয়া পুঠিয়ার অনেকে স্ব স্ব গৃহে সেই সকল পূজার অনুষ্ঠান করিতেন; মহারাণী দ্রব্যজাত এবং নগদ টাকার দ্বারা তাঁহাদিগের সাহায্য করিতেন।

অতি হীন জাতীয় হইলেও, মহারাণী কাহাকেও আপনার উচ্ছিষ্ট দিতেন না। তিনি শরীরীমাত্রের দেহেই পরমাত্মা স্বরূপ ঈশ্বরাধিষ্ঠান বিশ্বাস করিতেন। তাহার দুইটী দৃষ্টান্ত এস্থানে উল্লেখ করা যাইতেছে।

বরিশাল জেলার রাক্সা নিবাসী রাজমোহন সরকার নামক জনৈক কায়স্থজাতীয় ব্যক্তি, অসহ্য শূল বেদনায় অস্থির হইয়া ভগবান্ বৈদ্যনাথ দেবের নিকট হত্যা দিয়াছিল। তাহার প্রতি মহারাণী শরৎসুন্দরীর উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে, ব্যাধিশান্তি হইবার স্বপ্নাদেশ হয়। পরে রাজমোহন, মহারাণীর নিকটে আসিয়া তাঁহার উচ্ছিষ্ট প্রার্থনা করে। কিন্তু তিনি, দেবাজ্ঞা শুনিয়াও আপনার কর্ত্তব্য বিস্মৃতা হইলেন না। তাহাকে কোনও মতেই উচ্ছিষ্ট প্রদানে স্বীকৃতা হইলেন না। অবশেষে সেই কায়স্থ সন্তান তাঁহার দ্বারে অনাহারে হত্যা দিয়া রহিল। তখন মহারাণী মহাব্যাকুলা হইয়া পণ্ডিতদিগের অভিমত লইয়া একটী পাত্রে ফল সাজাইয়া তিনি পবিত্র হস্তে তাহার মধ্য হইতে একটী ফল তুলিয়া আহার করিলেন, এবং পাত্রস্থ ফল সেই কায়স্থ সন্তানের নিকট প্রেরিত হইল। কায়স্থ সন্তান, তাহাই মহাপ্রসাদ-জ্ঞানে ভক্তিপূর্ব্বক আহার করিয়া কঠোর ব্যাধি হইতে উদ্ধারলাভ করিল। রাজমোহন, তাঁহার নিকট কিছু প্রার্থনা না করিলেও, মহারাণী তাহাকে পাথেয় স্বরূপ তিনশত টাকা প্রদান করিয়াছিলেন।

মহারাণী কাশীধামে অবস্থানকালে একটী হীনজাতীয় অন্ধ, তাঁহার নিকটে প্রকাশ করে যে, সে দেবাদিদেব বৈদ্যনাথধামে হত্যা দিয়া মহারাণীর চরণামৃত পানে ব্যাধিমুক্তির আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু মহারাণী আপনার পদধৌত জল কোনও মতেই দিতে সম্মতা লইলেন না। অবশেষে দাসীদিগের নিকটে অন্ধ মিনতি পূর্ব্বক প্রার্থনা করিলে তাহারা গোপনে মহারাণীর স্নানাভিষিক্ত কিছু জল লইয়া দিয়াছিল। এবং তাহাতেই সে কৃতার্থ হইয়া যায়।

মহারাণী, আপনি গর্ব্বিতা না হইলেও, পুঠিয়া রাজবংশের সম্মানের প্রতি লক্ষ করিয়া সকল কার্য্য করিতেন। পলসা নিবাসী মুকুন্দনাথ ভট্টাচার্য্য * অসহ্য শূলবেদনায় সর্ব্বদাই কাতর থাকিতেন, একদিন স্বপ্নে দেখিলেন যে, মহারাণী শরৎসুন্দরীর নিকটে ভিক্ষা করিয়া ভিক্ষা-লব্ধ টাকায় নাটোরের তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী পবিত্রসলিলা আত্রেয়ী নদীর তীরস্থ বাক্‌সরের কালীমাতার অর্চ্চনা করিলে রোগ মুক্ত হইবেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিষ্ঠাবান্ আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী এবং সুপণ্ডিত। তিনি বহুপথ অতিবাহিত করিয়া পুঠিয়ায় মহারাণীর নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত অবস্থা নিবেদন করিলেন। মহারাণী, এই বিষয়ে কর্ম্মচারীদিগের অভিমত জিজ্ঞাসা করিলে কেহ পাঁচ টাকা, কেহ বা উদারতা দেখাইয়া দশটাকা পর্য্যন্ত দিবার অভিমত ব্যক্ত করিলেন। তাহাতে মহারাণী কহিলেন যে "ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এরূপ এক এক শিষ্য আছেন যে, এক জনেই এই কার্য্যে দশ সহস্র টাকা সাহায্য করিতে পারেন। তদ্ভিন্ন তিনিও একজন সম্পত্তিশালী ব্যক্তি। তিনি কোনও দিবসই এখানে ভিক্ষা করিতে আইসেন নাই, কিম্বা তাঁহার ভিক্ষা করা ব্যবসায়ও নহে। অতএব অদ্য তাঁহাকে এক টাকা দিলেও তিনি ব্যাধি

* ইনি গুরুব্যবসায়ী ও সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি। অনেক বড়লোক ইহাঁদিগের শিষ্য।

মুক্তির আশায় তাহাই গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ বোধ করিলেও, পুঠিয়া রাজধানীর সম্মানের প্রতি আমাদের সকলেরই দৃষ্টি করিতে হয়। অতএব আমি পাঁচ শত টাকার ন্যূনে এই ব্যক্তির ভিক্ষা, কল্পনা করিতেও লজ্জিতা হইতেছি।” এই কথায় কর্ম্মচারীদিগের জ্ঞানোদয় হইল; তাঁহারাও শেষে পাঁচ শত টাকা দানেই সম্মত হইলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় সম্পূর্ণ টাকায় বিশেষ সমারোহে বাকৃসরে পূজা দিয়া চরিতার্থ হইয়াছিলেন।

মহারাণী, প্রকৃত বিশ্বাস-পাত্রকেই বিশ্বাস করিতেন, অথচ তাঁহার কার্য্যপ্রণালীর সুব্যবস্থায় অন্যে তাহা বুঝিতে পারিত না। বরং তাঁহার কর্ম্মে সংসৃষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই মনে মনে জানিত যে, তিনি সকলকেই তুল্যরূপে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। বিশ্বাসপাত্র নির্ব্বাচনেও প্রায় তিনি অনুতপ্তা কিম্বা লক্ষ্যভ্রষ্টা হইতেন না। তিনি পরচিত্তপরিজ্ঞান-কুশলা ছিলেন বলিয়া অন্তঃপুরে থাকিয়া বিস্তৃত রাজত্ব সুন্দররূপে শাসন করিতে পারিয়াছেন।

সম্পত্তি শাসনকার্য্যে তাঁহার উচ্চবেতনের কর্ম্মচারীসকল থাকিলেও নিম্নশ্রেণীর বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীদিগকে মন্ত্রণাসমিতিতে গ্রহণ করিতেন। এরূপস্থলে তাঁহাকে কেহই কোনও বিষয়ে অযথা আত্মানুবর্ত্তীতায় লইতে পারে নাই। পাঁচ সাত জন একত্র পরামর্শ করিয়া বাদানুবাদে তিনি যে পক্ষকে সমর্থন করিতেন, সেই পক্ষের মতানুসারেই কার্য্য হইত। তাঁহার প্রচলিত সুনিয়মে প্রধান কর্ম্মচারীগণ তাঁহার নির্দ্দিষ্ট বিশ্বস্ত নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারীর অগোচরে স্বাধীনভাবে কোন কার্য্য করিতে পারিতেন না। কোনও গুরুতর বিষয়ে কার্য্যকারকদিগের বিশেষ মতবৈষম্য ঘটিলে, রাজসাহী কিম্বা কলিকাতা হাইকোর্টের উকিলদিগের মত লইয়া সেই কার্য্য সম্পাদন করিতেন।

তাঁহার রাজত্ব-সংক্রান্ত কার্য্য হইতে ধর্ম্ম পুণ্য বিষয়ক যাবদীয় কার্য্য, আড়ম্বরশূন্য, সকলের শান্তিপ্রদ, এবং সন্তোষজনক ছিল। এক জন গুরুতর অপরাধ করিলেও, যে কিছু অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন, তাহাতেই দোষীর গুরুতর শাসন হইত। কেন না সকলেই তাঁহার কথাকে দৈববাণীরূপে, এবং তাঁহার অসন্তোষ সর্ব্বনাশকর বলিয়া গাঢ় বিশ্বাস করিত। তিনি, মনে মনে রুষ্ট হইয়াছেন, দোষী ব্যক্তি ইহা বুঝিলেই সে মৃত্যুবৎ যাতনা অনুভব করিত। তাঁহার স্নেহচ্যুত হইতে অতি নরাধমেরও প্রবৃত্তি হইত না।

কখন, কর্ম্মচারীগণ, কোনও অপরাধীকে অর্থদণ্ড কি অপমানিত করিতেছেন, মহারাণী এরূপ কথা শুনিলে তাঁহার আহার নিদ্রা রহিত হইত। একবার কোন প্রজাকে গো-হত্যা অপরাধে, প্রধান কর্ম্মচারী এক শত টাকা অর্থদণ্ডের আদেশে আবদ্ধ রাখিয়া স্নানাহার জন্য স্ব-গৃহে গিয়াছিলেন। বেলা দুই প্রহরের পর, মহারাণী শুনিতে পাইলেন যে, সেই অপরাধী ব্যক্তি অনাহারে কষ্ট পাইতেছে। অথচ এই মধ্যাহ্ন কালে প্রধান কর্ম্মচারীর বিশ্রামকালে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া ত্যক্ত করাও বৈধ নহে, কিম্বা তাঁহাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া দণ্ডাজ্ঞার রূপান্তর দ্বারা প্রধান কর্ম্মচারীকে অপমানিত করাও কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং নিরূপায়ে প্রজার দুঃখে তিনি শোকাকুলা হইয়া স্বয়ং স্নানাহার না করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। দিবা চারি ঘটিকার সময় প্রধান কর্ম্মচারী সেই বিষয় শ্রবণমাত্র, সত্বরে দরবার গৃহে আসিয়া মহারাণীকে আগমনসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। তখন মায়াময়ী শরৎসুন্দরী, দরবার গৃহে আসিয়া প্রজার অপরাধের বিষয় প্রধান কর্ম্ম-চারীর নিকট শুনিয়া কহিলেন যে,—"যদি সে প্রকৃতই অপরাধী হয়, তবে বারান্তরে এরূপ না করিবার নিমিত্ত শাসন করিয়া দিলেই হইতে

পারে। অথবা যদি সে পুনঃ পুনঃ এইরূপ অপরাধ করিয়া থাকে, তবে তাহাকে আমার অধিকার হইতে তুলিয়া দিলেই তাহার গুরুতর শাস্তি হয়। তাহা না করিয়া সেই পাপীর অর্থ আমার তহবিলে আনিয়া আমাকে পর্য্যন্ত পাপগ্রস্তা করা বোধ হয় ভাল হয় নাই।"

মহারাণী এই জন্য অনাহারে রোদন করিতেছেন, ইহা জানিয়াই প্রধান কর্ম্মচারী, বিশেষ লজ্জিত হইয়াছিলেন। তখন তিনি অতি বিনীতভাবে কহিলেন—"মা! আমি প্রজাকে এখনই ছাড়িয়া দিতেছি, আপনি স্নান আহার করুন।" দৃঢ় অধ্যবসায়-শালিনী মহারাণী উত্তর করিলেন যে—"আপনি স্বীকার করুন্ যে, আর কোন দিন কাহাকেও এইরূপ কষ্ট দিবেন না, তাহা হইলে আমি স্নান আহার করিব।" প্রধান কর্ম্মচারী তাহাই স্বীকার করিলেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মহারাণী শরৎসুন্দরী, আপনার চরিত্র-গঠনের কোন প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত না পাইয়া, এবং হিংসা দ্বেষপূর্ণ সঙ্কীর্ণ-হৃদয়া স্ত্রী-মণ্ডলীর মধ্যে থাকিয়াও, আত্মপ্রকৃতির মহত্বে এই অতুলনীয় চরিত্র লাভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালে কেহ কেহ পরমা সাধ্বী সীতা এবং সাবিত্রীকে কবি কল্পিত চিত্র বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের একবার শরৎসুন্দরীর চরিত্র আলোচনা করিলে আর সে ভ্রান্তি থাকিবে না। শরৎসুন্দরীর মহৎ চরিত্র এক প্রকার কবি কল্পনারও অতীত। কবিরা, সর্ব্বংসহা বসুমতীকে ক্ষমাগুণের আদর্শে গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু কেহ ভূমিতে পদাঘাত করিলে প্রতিঘাতের কষ্ট পাইয়া থাকে, ফলতঃ ক্ষমাময়ী শরৎসুন্দরীকে অনেকে অযথা আক্রমণ করিয়াও প্রতিঘাত পায় নাই। শত শত দুষ্ট স্বভাবা হিংসা পরায়ণা স্ত্রীলোকে, তাঁহার অপরিসীম দয়ায় অসাধারণ ক্ষমাশীলতার মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থা হইয়া তাঁহার প্রসাদে পরম সুখে থাকিয়াও তাঁহাকে দিবারাত্রি যাতনা

দিয়াছে। কিন্তু, তিনি তজ্জন্য একটী কথাও বলেন নাই। তিনি যেন, ঈশ্বরের হস্তস্থিত কলের পুত্তলিকার মত সংসারে আসিয়া খেলা করিয়া গিয়াছেন, যেন তাঁহার দেহে মানব সুলভ রক্ত মাংস ছিল না, সুতরাং রাগ দ্বেষাদি রিপুতে তাঁহাকে অনুমাত্রও আক্রমণ করিতে পারে নাই।

মহারাণী সকলের অনুরোধে আপনার আন্তরিক ইচ্ছার বিরুদ্ধেও রাজপুরুষদিগের সন্তোষের জন্য বিস্তর টাকা দান করিতেন। আর প্রতারণা করিয়াও অনেক দুষ্ট লোকে তাঁহার নিকট দরিদ্রতা জানাইয়া অর্থ লাভ না করিয়াছে এরূপ নহে। কিন্তু, ঐ সকল বিষয় প্রকাশ হইলেও তিনি ক্ষুব্ধা হইতেন না; কর্ম্মচারীগণ বিশেষ চেষ্টা করিয়া ঐরূপ দৃষ্টান্তসকল উপস্থিত করিলে, মহারাণী বলিতেন যে, দানে এইরূপ সন্দেহ করিলে সম্ভবতঃ প্রকৃত দরিদ্রও বঞ্চিত হইতে পারে। কেহ প্রতারণা করিয়া আমার সর্ব্বস্ব লইতে পারে নাই, অতএব দশ জন প্রতারকে আমার নিকট কিছু লইবে বলিয়া দুঃখী সাধারণের জন্য কঠিন নিয়ম করিলে তাহাদের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার হইবে। জগদীশ্বর আমাকে যাহা করাইতেছেন, আমি তাহাই করিতেছি। তাঁহার নিয়োগ ব্যতীত আমার নিজের কোন ক্ষমতা নাই, সুতরাং আমি দশ জন প্রতারকের বঞ্চনায় দুঃখ বোধ করি না।”

মহারাণী শরৎসুন্দরী, এইরূপে অষ্টাদশ বৎসর রাজকার্য্য করিয়া কাশীবাস নিমিত্ত স্থিরসঙ্কল্প করিলেন। শরীরের প্রতি দারুণ তাচ্ছিল্য ব্যবহারে এবং ব্রত উপবাসাদির কঠোর নিয়মে অর্শ, অম্লপিত্ত, উদরাময় এবং পুরাতন জ্বরে তিনি ক্রমেই রুগ্না হইলেন। একজন সুবিজ্ঞ আয়ুর্ব্বেদ মতের চিকিৎসক তাঁহার বেতনভোগী ছিলেন। কিন্তু চিকিৎসক থাকিয়াও লাভ ছিল না। চিকিৎসক, ঔষধাদি নিয়ম

মতে প্রদান করিতেন, এবং তিনিও তাহা গ্রহণ করিতেন, অথচ এক দিনের জন্যও ঔষধ সেবন করিতেন না। *

তিনি, কাশীযাত্রার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে কুমারও তাঁহার সঙ্গে যাইতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। অবশেষে তিনি কুমারকে নানা মিষ্ট

---

* মহারাণীর গৃহ চিকিৎসক পণ্ডিতবর রাধিকাধর কবিরাজ মহাশয়, লেখকের নিকট এই সম্বন্ধে একটী গল্প করিয়াছিলেন। তিনি, বলিয়াছিলেন যে—"মহারাণীর নানা পীড়ার সূত্রপাত হইতেই আমি চিকিৎসা করিতাম। প্রাতে দরবার গৃহে যাইয়া চিকের বাহিরে থাকিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিতাম। কিন্তু, দীর্ঘকালেও ব্যাধির উপশম কিম্বা নাড়ীর পরিবর্ত্তন না দেখিয়া অকৃতকার্য্যতায় চিত্তে বড়ই ধিক্কার বোধ হইত। হৃদয়ে সর্ব্বদাই দুশ্চিন্তা ভোগ করিতাম। একদিন সাড়ে তিন আনীর (মহারাণীর অন্যতর অংশী) বাড়ীতে চিকিৎসা উপলক্ষে গিয়া বৈঠকখানায় পাদচালন করিতেছি। সাড়ে তিন আনীর বাড়ীর নিকটেই মহারাণীর থাকিবার গৃহের পশ্চাৎ দিকের অংশ সংলগ্ন, সুতরাং মহারাণীর বাসগৃহের আবর্জ্জনাদি যাহা পশ্চাৎ দিকের জানালা হইতে নিক্ষিপ্ত হইত, সাড়ে তিন আনীর বাড়ী হইতে তাহা উত্তমরূপে দেখা যায়। আমি ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলাম যে, ঐ আবর্জ্জনা রাশির মধ্যে অনেকগুলি কলাপাতের পুটুলী স্তূপীকৃত রহিয়াছে। ঐ পুটুলিগুলি দেখিয়া তাহার রহস্য ভেদ জন্য আমি বড়ই উতলা হইয়া একজন লোক দ্বারা তাহার কতকগুলি নিকটে আনাইলাম। পরে তাহা খুলিয়া দেখিয়াই হতবুদ্ধি হইলাম। দেখি যে, আমি প্রত্যহ যে সকল পাচন মহারাণীর নিমিত্ত অতি যত্নে পাঠাইয়া দিতাম, সেইগুলি যথাবৎ পুটুলিবদ্ধে আবর্জ্জনা রাশির মধ্যে পড়িয়া আছে। আমি তখন বুঝিলাম, যে মহারাণী আমার ব্যবস্থামত একটী ঔষধও গলাধঃকরণ করেন নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি আত্মীয়া, অনাত্মীয়া, বৃত্তিভোগিনী, পরিচারিকা মণ্ডলীর মধ্যে দিবারাত্রি বাস করিতেন, অথচ তিনি যে ঔষধ পাচন সেবন করেন না, একটী লোকেও তাহার তত্ত্ব রাখিত কি না সন্দেহ। বরং দাসীরা আমাকে প্রত্যহই বলিত যে, মহারাণী নিয়মমত ঔষধ সেবন করিতেছেন। এখন আমি বুঝিলাম যে তাহারা আমার পরিতোষ জন্য মিথ্যা কথা বলিত। আমি পর দিন মহারাণীর নিকটে ঐ কথা নিবেদন করায় তিনি প্রথমে কোনও উত্তরই করিলেন না। তখন, আমি বলিলাম যে, আপনি যখন ঔষধ ব্যবহার করেন না, তখন আমাকে এত টাকা বেতন দিয়া রাখা অন্যায়, আর আমারও থাকা কর্ত্তব্য নহে। তখন দাসীর দ্বারা বলিলেন যে, এখন আমি অনেক ভাল আছি, কাশীতে যাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ঔষধ খাইব। কিন্তু পরে কাশীতে যাইয়াও ঔষধ ব্যবহার করিতেন না।"

কথায় বুঝাইয়া ১২৯০ বঙ্গাব্দের ২৭শে অগ্রহায়ণ তারিখে কাশীধামে যাত্রা করিলেন। অন্তঃপুর বাসিনীদিগের মধ্যে যাঁহারা মাহারাণীর সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা করিলেন, তাঁহারা অনেকেই তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন।

মহারাণী, পুঠিয়া রাজধানীতে অবস্থিতি কালে কুমার যতীন্দ্র নারায়ণেরও ক্রমে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল। তিনি, বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীদিগের মন্ত্রণায় একখানি উইল করিয়াছিলেন। কিন্তু, সেই উইলের বৃত্তান্ত মহারাণীকে কিছুই বলা হইয়াছিল না। সেই মন্ত্রণায় মহারাণীর এক জন প্রাচীন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীও ছিলেন, তিনিও তদ্বিষয়ে কোন কথাই মহারাণীকে জ্ঞাপন করেন নাই। দুষ্টলোকের হাতে স্বর্গও নিরাপদ নহে। বিশেষতঃ বড়লোকের আশ্রয়ে নানা চরিত্র লোকের অভাব নাই। অনেকেই এই উপলক্ষে মহারাণীর নিকটে নানা কথা বলিতে লাগিল। কেহ বা সেই প্রাচীন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে স্বার্থশীল প্রতিপন্ন জন্য বলিল যে, কুমারের দ্বারা উইলে সেই কর্ম্মচারী নিজের কোনও গুরুতর উদ্দেশ্য সাধন করিয়া লইয়াছেন, তাহাতেই উইলের বিষয় মহারাণীর নিকটে গোপন করা হইয়াছে। কেহ কেহ বা অন্যরূপ জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিল। মহারাণী, কাহারও কথায় আস্থা স্থাপন করিলেন না। অথচ এই বিষয় কুমারকে কিম্বা কর্ম্মচারীদিগকে একদিনের জন্যও জিজ্ঞাসা করিলেন না। বাস্তবিক পক্ষে কুমার আপন উইলে তাঁহার অভাব পরে সম্পত্তির কার্য্য সুনির্ব্বাহ নিমিত্ত তাঁহার মাতা মহারাণীর হাতে সম্পত্তি থাকার নিয়ম করিয়াছিলেন। মহারাণীকে সে বিষয় জানাইলে তিনি, তাহাতে সম্মতা হইতেন না, অথচ কুমারও মাতার আজ্ঞা পালন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না, সুতরাং তাঁহার মাতার হাতে সম্পত্তি থাকার সঙ্কল্প ভঙ্গ করিতে হইত। সেই কারণে উইলের বিষয় মাতাকে কিছু বলিয়াছিলেন না। এবং অন্যকে বলিতেও নিষেধ করিয়াছিলেন।

মহারাণী, কাশীধামে গমন করিবার সময়ে যদিও, কুমার মাতার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার সঙ্গে যাইতে পারেন নাই, কিন্তু মহারাণী বারাণসী যাত্রা করার পর, মাতৃভক্ত কুমার, মাতৃদর্শন লালসায় এত ব্যাকুল হইলেন যে, কাহারও কথা না শুনিয়া হঠাৎ কাশীধামে গমন করিয়া মাতৃচরণ দর্শনে কৃতার্থ হইলেন। কুমারের সেই যাত্রাই শেষ যাত্রা। মহারাণী, পুত্রের অনেক প্রকার চিকিৎসা করাইলেন। কিছু-তেই পীড়ার উপশম হইল না। অবশেষে ১২৯০ বঙ্গাব্দের ১৮ই ফাল্গুন তারিখে ছয় মাসের গর্ভবতী বালিকা পত্নী রাখিয়া কুমার মোক্ষধাম কাশীলাভ করিলেন।

কুমারের স্বর্গারোহণ অন্তে মহারাণী, তাঁহার উইলের বিষয় অবগত হইয়া নিতান্ত ক্ষুণ্ণ চিত্তা হইলেন। মহারাণীর আপনার গর্ভে সন্তান না জন্মিলেও দত্তকের অসাধারণ মাতৃভক্তিতে প্রকৃত পুত্রবতী হইয়াছিলেন। বিধাতা, সেই পুত্রকেও অকালে গ্রহণ করিলেন। তখন আর তিনি কাশীধাম ত্যাগ করিয়া সম্পত্তির কার্য্য চালনা করিতে কিছুতেই স্বীকৃতা হইলেন না।

তিনি, বধূরাণীর পিতা প্রভৃতি আত্মীয়গণকে আনাইয়া এই প্রস্তাব করিলেন যে, বধূরাণী বয়ঃপ্রাপ্তা হইতে যে কাল অবশিষ্ট আছে, সে কাল পর্য্যন্ত সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডেশের তত্ত্বাধীনে রাখাই ভাল বোধ করেন। কিন্তু, তাঁহারা কিম্বা পুঠিয়া রাজধানীর হিতৈষী কোন ব্যক্তিই এ পরামর্শে সম্মত হইলেন না। সকলেই এক বাক্যে তাঁহার হস্তে সম্পত্তি রাখিবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তিনি কোন অনুরোধেই বাধ্যা না হইয়া সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডেশের তত্ত্বাধীনে দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু, গবর্ণমেণ্ট, মহারাণীর মহীয়সী কীর্ত্তি, এবং অনন্যসাধারণ গুণ পরম্পরায় বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন।

অতএব সম্পত্তির ভার মহারাণীর প্রতিই অর্পিত হইল। তিনি অগত্যা পুঠিয়া রাজধানীতে একজন সুযোগ্য প্রধান কর্ম্মচারী রাখিয়া সম্পত্তির কার্য্য চালনা করিয়াছিলেন ব্যতীত, আর পুঠিয়া গমন করিলেন না।

১২৯১ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে মহারাণীর পুত্রবধূ রাণী হেমন্তকুমারী দেবী নির্ব্বিঘ্নে এক কন্যা প্রসব করেন। মহারাণী সেই বালিকা পুত্র-বধূ এবং পৌত্রীকে নিকটে রাখিয়া কাশীধামে কঠোর নিয়ম দ্বারা ধর্ম্মারাধনায় দেহ ক্ষয় করিতে লাগিলেন। কাশীধামে তিনি দুর্গোৎসব, বাসন্তী, অন্নপূর্ণা পূজা এবং সরস্বতী পূজাদি কার্য্য অতি পরিপাটীরূপে নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার সঙ্গে একটী শালগ্রাম শিলা সর্ব্বদাই রাখিতেন। শালগ্রামের নিত্য পূজান্তে ভোগ হইলে সেই প্রসাদ মাত্র গ্রহণ করিতেন।

তাঁহার রাজধানীতে অবারিত অতিথি সেবা থাকিলেও, বারাণসী-ধামের অন্নসত্রে প্রত্যহ অর্দ্ধ মণ তণ্ডুল ও তদুপযোগী অন্যান্য সামগ্রী বৃদ্ধি করিয়া সত্রের বিশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন। এই সত্র, রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণের পিতামহী রাণী ভুবনময়ী স্থাপন করিয়াছেন। মহারাণী, বিধবা হইয়া অবধি, চন্দ্র এবং সূর্য্য গ্রহণ যত গুলি হইয়াছে, তাহাতে মন্ত্র পুরশ্চরণ এবং প্রভূত পরিমাণে দানাদি করিতেন। তাঁহার প্রত্যহ নিত্য পূজায় প্রায় দশ টাকা মূল্যের ভোজ্য সামগ্রী এবং নগদ পাঁচ টাকা দানের নিয়ম ছিল। কাশীধামে অবস্থিতিকালে প্রতি মাসে পঞ্চ পর্ব্বে কাশীস্থ পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া জলপান করাইয়া যথা সম্ভব টাকা দিয়া বিদায় করিতেন। মহারাণী, অনেক অপরিচিত বিদ্যার্থীকে কাশীধামে বেদ পাঠের সাহায্য করিতেন। তন্মধ্যে দুইটী দূরদেশীয় বিদ্যার্থীর প্রত্যেককে মাসিক কুড়ি টাকা

নিয়মে পাঠের ব্যয় প্রদান করিতেন। প্রত্যহ স্ব-পাকে এক হইতে দুই তিন জন পর্য্যন্ত দণ্ডী ভোজন করাইতেন।

কাশীধামে তিনি প্রত্যহ প্রাতে গঙ্গাস্নান অন্তে কোন কোন পর্ব্ব দিনে দেবালয়ে গমন করিতেন। নতুবা প্রাতঃ সন্ধ্যাদি সমাপন করিয়া সমাগত পত্রাদি পাঠ এবং তাহার উত্তরের ব্যবস্থার পর দিবা ১১টা পর্য্যন্ত দরিদ্রদিগের প্রার্থনা শুনিতেন। তাহার পরে বিষ্ণুর সহস্র নাম পাঠ, নিত্যপূজা ও জপ করিতেন। অবশেষে ৩টার সময় প্রাণধারণ উপযুক্ত হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়া পুরাণ শ্রবণে দিবাবসান হইত। তাহার পর সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্তে জপ করিয়া শয়ন করিতেন।

মহারাণী কাশীধামে গমন পর, সংস্কৃত কাশীখণ্ডের ব্যাখ্যা শুনিয়া কাশীখণ্ডের পদ্ধতি অনুসারে কর্ত্তব্যগুলি এত সাবধানে নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, যে, কোন একটী সামান্য বিষয়েও অঙ্গ ভঙ্গ হইয়াছিল না। তিনি, শাস্ত্র-দৃষ্ট প্রণালীতে কর্ম্ম সকল নির্ব্বাহ করিয়া, কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মক্ষয় মাত্র করিতেন। তাঁহার কোনও কর্ম্মেরই ফলাভিসন্ধি ছিল না। কিন্তু কিছুতেই তিনি, আত্মার শান্তি লাভ করিয়াছিলেন কি না, তাহা সর্ব্বান্তর্যামী ভগবানই বলিতে পারেন। ফলতঃ অন্যে তাঁহাকে চিরদিনই অশান্তি ভোগ করিতে দেখিয়াছে।

তাঁহার পুত্রবধূ রাণী হেমন্তকুমারী, তাঁহাকে মাতার ন্যায় ভক্তি করিতেন, এবং তিনিও বিধবা পুত্র বধূকে কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন। কিন্তু তাহা বলিয়া পিশাচের দল কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে পারে না। তাঁহার অন্নপুষ্ট পিশাচগণ, তাঁহার নিকটে বাস করিয়াও তাঁহাকে চিনিতে পারিত না। তাঁহার অসাধারণ ক্ষমাশীলতাকে তাহারা আপনার দুরভিসন্ধি সাধনের প্রশস্ত পথ মনে করিত। পিশাচগণ, তাঁহার রক্ত মাংস ভোজনেও পরিতৃপ্ত না হইয়া বালিকা পুত্রবধূর সহিত তাঁহার

মনান্তর ঘটাইবার অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। মহারাণী, পুত্রের অভাবের পর হইতে তাঁহার পুত্রবধূর পিতা প্রভৃতি আত্মীয়গণকে অতি সমাদরে নিকটে রাখিতেন, অনেক বিষয়ে তাঁহাদের মন্ত্রণাও গ্রহণ করিতেন। স্বার্থান্ধদিগের চক্ষে তাহা শূলবৎ বিদ্ধ হইত। অথচ মহারাণীকে বলিয়া কহিয়া তাহাদের নরকময় স্বার্থের পথে আনিবার সাধ্য ছিল না। তখন তাহারা, মন্ত্রণা করিয়া বধূরাণী হেমন্তকুমারীর আত্মীয়গণকে নানা প্রকারে উত্যক্ত আরম্ভ করিল। অবশেষে তাঁহাদিগকে নানা প্রকারে অপমানিত করিতেও ত্রুটি করিল না। অতএব অল্প দিনের মধ্যেই মহারাণীর অলক্ষিতে দুইটী দল বান্ধিয়া উঠিল।

মহারাণী এই বিষয় অবগত হইয়া কাহাকেও কিছুই বলিলেন না। তিনি মনে মনে কিছুদিন তীর্থযাত্রা উপলক্ষে সর্ব্বপ্রকারে সকলের সংস্রব ত্যাগের ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু, স্বার্থান্ধগণ, তাহাতে ঘোর বিরক্ত হইয়া "আপনি যেমন ক্ষমাশীলা, ইহাতে আপনার অচিরায় ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। আপনি এখন পুত্র-বধূকে এখানে রাখিয়া তীর্থ গমন করিলে তাঁহার আত্মীয়গণ আপনার সর্ব্বনাশ করিবে।" ইত্যাদি নানা কথায় তাঁহাকে উদ্দীপিত করিতে লাগিল। তাহারা কখন কখন, ক্ষমাশীলা দয়াময়ীকে কটু ভাষায় ভর্ৎসনা করিতেও ত্রুটী করে নাই। কিন্তু, তিনি সে সময়ে একটী মাত্রও কথা না বলিয়া নীরবে রোদন করিতেম। তিনি, কাহারও কথায় কোন উত্তর প্রদান না করিলেও আপনার সঙ্কল্প ভঙ্গ করিলেন না। বিধাতার অনুগ্রহে এই সময়ে তাঁহার তীর্থ যাত্রার সুবিধাজনক একটী ঘটনা উপস্থিত হইল। *

* একটী মোকদ্দমায় রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য রায় বাহাদুর তাঁহাকে সাক্ষি মান্য করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি এজীবনে কোনও দিন শপথ করিয়া সাক্ষি প্রদান করেন নাই,

তিনি ১২৯২ বঙ্গাব্দের শীতকালের প্রথমে বধূরাণীকে তাঁহার পিতৃকুলের অভিভাবকদিগের রক্ষণাধীনে রাখিয়া তীর্থ যাত্রায় বহির্গত হইলেন। তাঁহার গর্ভধারিণীও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তিনি বিন্ধ্যাচল ও প্রয়াগ হইয়া অযোধ্যায় গমন পূর্ব্বক পদব্রজে অযোধ্যার চতুঃসীমা প্রায় ১৪।১৫ ক্রোশ প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন। সে সময়ে তিনি যেরূপ বিবিধ রোগে পরিক্ষীণা হইয়াছিলেন, অন্য দুঃখিনীরাও সেরূপ অবস্থায় পদব্রজে এত পথ অতিবাহিত করিতে পারিত কি না সন্দেহ। অযোধ্যা হইতে এলাবন, চিত্রকূট, ওঙ্কারেশ্বর, নর্ম্মদেশ্বর এবং দণ্ডকারণ্যের কিয়দংশ পর্য্যটন অন্তে নৈমিষারণ্য, পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, কনখল, জ্বালামুখী, কাঙ্গড়া, মথুরা এবং বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ পর্য্যটন করিয়া বৈশাখ মাসে কাশীধামে প্রত্যাগমন করেন। তিনি যে যে তীর্থে গমন করিয়াছিলেন, সেই সেই তীর্থের পদ্ধতি অনুসারে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। এবং প্রতি স্থানেই প্রভূত দান করিয়াছিলেন। অযোধ্যা এবং পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থে সহস্র সহস্র সাধু ভোজন করাইয়াছিলেন। জ্বালামুখী তীর্থে ১২৯২ বঙ্গাব্দের ১লা চৈত্রে তাঁহার স্নেহময়ী জননী কলেবরত্যাগ করায় তিনি অন্য তীর্থে গমন রহিত করিয়া বারাণসীতে প্রত্যাগমনে বাধ্যা হইয়াছিলেন।

তিনি কাশীধামে আসিয়া স্নেহময়ী পুত্রবধূর সহিত সম্মিলতা হইলেন। তাঁহার পুত্রবধূ রাণী হেমন্তকুমারী, নিতান্ত অল্পবয়স্কা হইলেও মহারাণীকে মাতৃবৎ ভক্তি করিতেন। কিন্তু পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, কতকগুলি দুষ্ট প্রকৃতি লোকের দ্বারা তাঁহাদের মধ্যে মনান্তরের সূত্রপাত হইয়াছিল। রাণী হেমন্তকুমারী, সেই সকল দুষ্ট লোককে

সুতরাং তীর্থ ভ্রমণে অনির্দ্দিষ্ট স্থানে বাসের দ্বারা সাক্ষ্য দায় হইতে মুক্তির অভিলাষ করিলেন।

এবং কর্ম্মচারীদিগের মধ্যেও কোন কোন ব্যক্তিকে পদচ্যুত এবং স্থানান্তরিত করিবার নিমিত্ত মহারাণীর নিকট অনুরোধ করিতে লাগিলেন। শরৎসুন্দরী যেরূপ ক্ষমাশীলা ছিলেন, তাহাতে কর্ম্মচ্যুত করা দূরের কথা কাহাকেও অপ্রিয় কথা পর্য্যন্ত বলিতে পারিতেন না। সুতরাং তিনি ছার সম্পত্তিই যত অনর্থের মূল বিবেচনায় সকল দিক্ রক্ষা এবং আপনার চিত্তে শান্তি লাভের নিমিত্ত সম্পত্তির কার্য্য ভার ত্যাগ করিতে অভিলাষিণী হইলেন। কর্ম্মচারীগণ, তাঁহার অভিমত কার্য্যে শৈথিল্য করিতে পারে বলিয়া আপনি বিশেষ রুগ্না হইলেও ১২৯৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে পুঠিয়া আগমন করিলেন। আসিবার কালে পুত্রবধূকে সঙ্গে আনিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু, রাণী হেমন্তকুমারী, নানা আশঙ্কায় পুঠিয়া আসিতে সম্মতা হইলেন না। অতএব মহারাণী, বালিকা বধূ এবং পৌত্রীকে নানা প্রকারে বুঝাইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে কাশীধাম ত্যাগ করিলেন। তাঁহার পুত্রবধূ, তদীয় পিতা প্রভৃতির রক্ষণাধীনে রহিলেন বলিয়া মহারাণী তাহাতে অনুমোদন করিয়াছিলেন। মহারাণী, পুঠিয়া আসিয়া আপনার রাজধানীতে গমন না করিয়া তাঁহার অংশী, মৃত রাজা ভৈরবেন্দ্র নারায়ণের জনহীন জীর্ণগৃহে এবং কখন কখন পিতৃগৃহে বাস করিয়াছিলেন। তিনি, পুঠিয়া আসিয়াই সকলের নিকট সম্পত্তির কার্য্যভার ত্যাগের অভিমত ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার কথায় অনুমোদন করিলেন না। তখন তিনি, এরূপ সংসার বিরক্তা হইয়াছিলেন, যে, কাহারই কথা না শুনিয়া সম্পত্তি, বধূরাণীর বয়ঃপ্রাপ্ত কাল পর্য্যন্ত কোর্ট অব ওয়ার্ডেশের তত্ত্বাধীনে লইবার জন্য স্বয়ং রাজসাহীর কালেক্টরের নিকট প্রার্থনা করিলেন। গবর্ণমেণ্টের নিয়মিত সেপানাবলীতে কার্য্য প্রণালী হেতু তাঁহার অভিলাষ পূর্ণের ক্রমেই বিলম্ব হইতে লাগিল; এ দিকে তিনি, অর্শ,

অম্লপিত্ত, উদরাময়, শোথ এবং অহোরাত্রিব্যাপী লগ্নজ্বরে শয্যাগতা হইলেন। এরূপ অবস্থাতেও তাঁহার বিশ্রাম নাই। তাঁহার রুগ্ন শরীরের প্রতি কেহই দৃষ্টি করে না। তিনি বহুদিন পরে রাজধানীতে আসিয়াছেন, ইহার পর আর তাঁহাকে নিকটে পাইবে না, বলিয়া দলে দলে প্রার্থী আসিয়া তাঁহাকে দিবারাত্রি উদ্বেগ করিতে লাগিল। গৃহ চিকিৎসক, শত শত নারী-সমাজ হইতে তাঁহাকে স্বতন্ত্র স্থানে বাসের বিশেষ অনুরোধ করিলেন। উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ঔষধ প্রদান করিতে লাগিলেন, কিন্তু অম্লপিত্তের আধিক্যে কিছুই তাঁহার উদরস্থ থাকে না বলিয়া, তিনি, কোন ঔষধই ব্যবহার করিতেন না। অবশেষে সকলের অনুরোধে শয্যাগতা অবস্থায় আপনার রাজধানীতে আসিয়াছিলেন।

এদিকে দরিদ্রা অনাথাগণ, মহারাণী নির্জ্জনে থাকিবেন শুনিয়া ব্যাকুলা হইয়া উঠিল। "আমরা আর মাকে দেখিতে পাইব না, মার নিকটে থাকিতে পাইব না" বলিয়া সকলে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। মহারাণী, সকলকেই আশ্বাসিত করিয়া সর্ব্বদা যেমন হাটের মধ্যে বাস করিতেন, আপনার গৃহে গিয়াও তাহাই করিতে লাগিলেন। সেই স্বার্থ কুশলাগণ, বুঝিল না যে, যাঁহার শরীরমাত্র তাহাদের সকল সুখের, সকল অভাব পূরণের সম্বল, তাঁহার জীবনী-শক্তি যে এই সকল অত্যাহিতে ধ্বংস অভিমুখে যাইতেছে, তিনি, যে ব্যাধির যাতনায়, লোকের উৎপীড়নে আসন্নকাল পর্য্যন্তও শান্তি লাভ করিতে পারিতেছেন না, তাহা কেহ চিন্তাও করিল না।

এবার তিনি যেমন দুরন্ত ব্যাধির গ্রাসে পতিতা হইয়াছেন, অর্থীর গ্রাসও তাহা অপেক্ষা অল্প নহে। সুতরাং সুস্থ শরীর অপেক্ষা তাঁহাকে অধিক পরিমাণে পরিশ্রম করিতে হইত। প্রার্থিনীগণ অবারিত ভাবে তাঁহার নিকটে যাইতে পাইত। এবং পুরুষ প্রার্থীগণ অক্লেশে প্রার্থনা

জ্ঞাপন করিতে পারিত। যদিই বা কর্ম্মচারীগণ, মহারাণীর ঘোরতর পীড়ার ব্যপদেশে কোন কোন ব্যক্তিকে বিদায় করিয়া দিতেন, কিন্তু, পরে তাহা গোপন থাকিত না। মহারাণী এই নিমিত্তই তাঁহার নামিক কোন চিঠি কি আবেদন পত্র স্বয়ং পাঠ করিতেন, কেননা, তাহা হইলে কর্ম্মচারীগণ, কাহাকেও বিমুখ করিলে, কিম্বা কাহারও প্রতি অত্যাচার করিলে তাহা, তাঁহার জানিবার সুবিধা হইবে। কিন্তু, এখন দিবারাত্রির মধ্যে নানা কার্য্যে অবসর মাত্র হইত না, সুতরাং প্রাত্যহিক সমাগত পুঞ্জ পুঞ্জ পত্র পাঠ করিবারও সময় পাইতেন না। তিনি এই শয্যাগত রুগ্নাবস্থাতে একদিন কর্ম্মচারীগণের প্রস্তাবিত ব্যবহারের বিষয় অবগত হইয়া হৃদয়ে বড়ই ব্যথা পাইলেন। কিন্তু, দিনে দিনে তাঁহার নশ্বর দেহ ধ্বংস পথে অগ্রগামী, আপনার শক্তি, সামর্থ্য তিলে তিলে ক্ষয় পাইতেছে। তখন নিরুপায়ে কর্ম্মচারীদিগকে আহ্বান করিয়া কাতর ভাবে বলিলেন যে, "আমি আর অল্পদিন মাত্র আছি, অতএব আপনারা আর এই কয় দিনের জন্য কোন দরিদ্রকে রিক্ত হস্তে কিম্বা আমার অজ্ঞাতে বিদায় দিবেন না। সেরূপ করিলে বাস্তবিকই আমার হৃদয়ে ঘোরতর অশান্তি উপস্থিত হয়।"

ফলতঃ মহারাণীর এইরূপ অসুস্থ শরীরে কষ্ট লাঘব করা ব্যতীত কর্ম্মচারীদিগের মনে অন্য কোনরূপ দুরভিসন্ধি ছিল না। তাঁহারা অগত্যা প্রার্থী মাত্রের বিষয় তাঁহাকে বিদিত করিতে সম্মত হইলেন। অবশেষে তাঁহার এরূপ কার্য্য বাহুল্য হইয়া উঠিল যে, সকলের কথা শুনিতে,—সকলের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে, সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতে, প্রত্যূষ হইতে দিবাবসান পর্য্যন্ত শেষ করিতে পারিতেন না। প্রায় প্রত্যহই সন্ধ্যার পূর্ব্বে স্নান করিয়া কম্বলে অর্দ্ধ শয়নাবস্থায় নিত্য-পূজা শেষ করিতেন। কোন দিন সামান্য কিছু আহার করিতে পারি-

তেন, কোন দিন উপবাসী থাকিতেন। কিন্তু স্বার্থান্ধদিগের ইহাতেও তৃপ্তি নাই। একদিন মহারাণী, প্রস্তাবিত মতে কার্য্য শেষ করিয়া দিবাবসানে অন্য একটী স্ত্রীলোকের আশ্রয়ে ধীরে ধীরে ভোজন-গৃহে যাইতেছেন, এই সময়ে, তাঁহার অর্থে প্রতিপালিত তাঁহার হিতৈষীরূপী একজন ভদ্রলোক, ভোজন-গৃহের দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া পথরোধ করিয়া রহিলেন। মহারাণী ভোজন-গৃহের নিকট উপস্থিত হইলে সেই স্বার্থান্ধ কহিল যে—"আমার জোতের পত্রখানি না দিলে আমি পথ ছাড়িয়া দিব না। আমি দিবা রাত্রি মধ্যে চেষ্টা করিয়াও আপনার অবকাশ পাই না, এখন অবকাশ পাইয়াছি"। দয়াময়ী শরৎসুন্দরী যে, নানা ব্যাধিতে যাদশাপন্না কাতরা, সমস্ত দিন নানা কার্য্যে কষ্ট পাইয়া ক্ষুধা পিপাসায় কাতরা, স্বার্থান্ধ প্রার্থী, তাহা বুঝিয়াও বুঝিল না। কিন্তু, ক্ষমাশীলা, শরৎসুন্দরী কোন উত্তর না দিয়া তৎক্ষণাৎ ভোজন-গৃহের দ্বার হইতে ফিরিয়া দরবার গৃহে গমন করিলেন। এবং অবিলম্বে প্রার্থীর জোতের আদেশ পত্র লিখাইয়া স্বাক্ষর করিয়া দিলেন। তৎপরে দরবার গৃহ হইতে আসিবার কালে গৃহ দেবতা শ্রীশ্রীগোবিন্দ জিউর মন্দির অভিমুখী হইয়া গললগ্নীকৃতবাসে করুণ স্বরে প্রার্থনা করিলেন যে "গোবিন্দ! দাসীর এই ভিক্ষা যে, আমাকে আর যেন পুঠিয়া আসিতে না হয়, আর যেন দুঃখীদিগের নিরাশার নিশ্বাসে আমার হৃদয় দগ্ধ না হয়।" ভগবান্ গোবিন্দ জিউ, যেন তাঁহার প্রার্থনা দিব্য কর্ণে শুনিয়া প্রার্থিত বরপ্রদান করিলেন। সেই দিন হইতে তিন সপ্তাহের মধ্যে পুণ্যশীলা মহারাণী শরৎসুন্দরী, পুণ্য তীর্থ বারাণসীতে কলেবর ত্যাগ করিয়াছিলেন।

মহারাণী আপনার শরীর ক্রমশঃ ধ্বংস মুখে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সম্পত্তি সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের আদেশ আসিবার প্রতীক্ষা না করিয়া ১০ই

ফাল্গুণে যাত্রা করিয়া ১৫ই তারিখে বারাণসী ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে অন্নাহার এককালে ত্যাগ করিয়াছিলেন। এবারে তাঁহার গুরুপত্নীকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী, ভগিনীপতি প্রভৃতি অনেক আত্মীয় এবং অনাত্মীয় তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। তিনি, পুঠিয়া অবস্থিতি কালে অগ্রহায়ণ মাসে তাঁহার বালিকা পুত্র বধূ, শারীরিক পীড়িতা হইয়া কাশীধাম হইতে বৈদ্যনাথ ধামে আসিয়াছিলেন। অতএব কাশীতে গমন করিয়া তিনি স্নেহময়ী পুত্রবধূ কিম্বা পৌত্রীকে আর দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার জীবন-দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ বলিয়া সংসারের সকল মায়া, সকল মমতা ত্যাগ করিয়াছিলেন; অতএব পুত্রবধূ ও পৌত্রীকে নিকটে আনিবার চেষ্টাও করিলেন না। তিনি, বারাণসীধামে গিয়া যেন পরম শান্তি লাভ করিলেন। উত্থান সামর্থ্যহীন হইলেও তাঁহার আচার নিষ্ঠার কিছুই ব্যতিক্রম হইয়াছিল না। স্ববশে উঠিবার শক্তি ছিল না, তথাপি দাসীদিগের আশ্রয়ে মল মূত্র ত্যাগের নিয়মিত স্থানে যাইয়া মল মূত্র ত্যাগ করিতেন। আর এরূপ পীড়িত শরীরেও, নিয়মিত নিত্য পূজা, জপ, এবং শৌচাচারের লাঘব করিয়াছিলেন না। এইরূপে দশ দিন মাত্র জীবিত থাকিয়া বিস্তর টাকা দান করিয়া এবং আপনার ত্যক্ত সম্পত্তি ধর্ম্মকার্য্যে নিয়োগের ব্যবস্থা অন্তে ১২৯৩ বঙ্গাব্দের ২৫শে ফাল্গুণ দিবা দুই প্রহর দুই ঘটিকার সময়, ৩৭ বৎসর ৫ মাস ৫ দিন বয়সে সংসারের সকল জ্বালা, সকল যন্ত্রণা,—সকল কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইয়া কলেবর ত্যাগ করিয়াছিলেন।

মহারাণী শরৎসুন্দরীর কলেবর ত্যাগের বৃত্তান্তও, অলোক-সাধারণ দৈবলীলার ন্যায় আশ্চর্য্যজনক। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন, সম্পত্তি কোর্ট-অব ওয়ার্ডেশ গ্রহণ করিবেন না, এই বিষয়ের টেলিগ্রাফ পাইয়া অতি

কষ্টে নিকটস্থা কনিষ্ঠা সহোদরাকে কহিয়াছিলেন যে, "এইমাত্র যে সংবাদ পাইলাম, তাহা তোমরা শুনিয়াছ কি? পাপ আমাকে ছাড়িল না, সম্পত্তি ওয়ার্ডেস গ্রহণ করিল না। কিন্তু, আমি যে ছাড়িয়াছি, আর তাহা হাতে লইতে হইবে না।" সেই দিন দ্বাদশী, পূর্ব্ব দিনের একাদশীর উপবাসেও,তিনি কিছুমাত্র কাতর ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন না। সেইদিন শেষ রাত্রিতে একবার অধিক পরিমাণে দাস্ত হইয়া কিছু ক্লিষ্টা হইয়াছিলেন। ২৫শে ফাল্গুণ প্রাতে পুঠিয়ার পত্রাদি পাঠ অন্তে, প্রার্থীদিগকে সাধ্যমত দান করিয়া একবার পায়খানায় গমন করেন। সেবারেও অতিরিক্ত পরিমাণে দাস্ত হইয়া বড়ই অবসন্না হইয়াছিলেন। তখন সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার ভগিনী প্রভৃতি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি চৈতন্য পাইয়া সকলকেই "শরীর অনিত্য, কেহই চিরদিনের জন্য সংসারে আইসে না, তাঁহার মত অর্দ্ধমৃতা বিধবার আজি সুখের দিন" ইত্যাদি কথায় প্রবোধ দিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক নিত্য পূজার্থ কম্বলে শয়ন করিলেন। তখন সকলেই ঔষধ সেবন নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। কেহ বা, ঔষধ সেবন না করিয়া প্রাণত্যাক্ত হইলে আত্মহত্যার পাপ হয়, বলিয়া যুক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তখন তিনি একটী মাত্র ঔষধ খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহাই সম্পাদিত হইল। পরে গুরু-পত্নীকে শিরোদেশে উপবেশন করাইয়া তাঁহার চরণযুগল অর্চ্চনা অন্তে মালা জপ আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ভগিনী প্রভৃতিকে হঠাৎ তাঁহার এইরূপ নূতন ব্যবহার দৃষ্টে কান্দিতে দেখিয়া দিব্য জ্ঞান শালিনী শরৎসুন্দরী, ভগিনীদিগকে সেই শেষ সমাধির সময় বিরক্ত না করিয়া স্থানান্তরে যাইতে সঙ্কেত করিলেন। ক্রমে মালা ফিরাইতে ফিরাইতে দক্ষিণ হস্ত অসাড় হইয়া আসিল। এবং হাত হইতে জপমালা স্খলিত

হইবামাত্র জপ সাঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে অজপা শেষ হইল ; চক্ষু স্থির করিয়া অনন্ত নিদ্রায় অভিভূতা হইলেন। শেষ নিশ্বাস ত্যাগ পর্য্যন্ত, কেহই মৃত্যুলক্ষণ অনুভব করিতে পারিয়াছিল না। মৃত্যুর প্রাক্কালে মুখের জ্যোতিঃ যেন বৃদ্ধি পাইয়াছিল। উর্দ্ধশ্বাস অথবা অন্য কোনরূপ যাতনা, কিম্বা দেহের স্পন্দন মাত্রও, কেহ উপলব্ধি করিতে পারে নাই। নিকটে স্ত্রী পুরুষে অন্যূন পঞ্চাশ ষাইট জন ব্যক্তি তাঁহার মুখের দিকে দিবার দিব্যালোকে চাহিয়া থাকিয়াও, তাঁহার শেষ নিশ্বাসের কাল বুঝিতে পারে নাই। শেষে মালা পতনের পরে চক্ষু স্থির দেখিয়া তাঁহার জীবনান্ত বিষয়ে কাহার কাহার প্রতীতি হইয়াছিল।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াও প্রকৃত কর্ম্ম অনুষ্ঠানে তাঁহার অনুমাত্রও বিস্মৃতি কিম্বা বৈরক্তি ছিল না। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন তাঁহার ভগিনীপতির এক বিধবা ভ্রাতৃবধূর মৃত্যু হয়। মহারাণী, পরদিন আপনি মৃত্যুশয্যায় থাকিয়াও, তাঁহার শ্রাদ্ধের সাহায্য একশত টাকা দান করিয়া মৃতার আত্মীয়-দিগকে নানা কথায় সান্ত্বনা করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে কিম্বা মৃত্যুকালে, তাঁহার শরীরে অথবা স্বরে যাতনা সূচক কোনও লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল না। তিনি সুঠাম সুন্দরী না হইলেও তাঁহার বর্ণ সুগৌর ছিল। এবং আকৃতি সুদীর্ঘ ও হৃষ্ট পুষ্ট সুকান্তি যুক্ত ছিল। তাঁহাকে দেখিলে, স্বর্গীয়া দেবী বলিয়া বিশ্বাস হইত। তাঁহার আসন্ন-কালে কোন প্রকার মৃত্যুলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল না। বরং তিনি পূজা এবং জপে নিয়তা ছিলেন বলিয়া, অনেকেই তাঁহার আসন্ন কাল বুঝিতে পারিয়াছিল না। ধর্ম্মময়ী স্বর্গ সুন্দরী; মর্ত্ত্যলীলা সাঙ্গ করিয়া অনন্ত ধামে অনন্ত ব্রহ্মে লীন হইলেন, তথাপি দেহের কান্তি এবং মুখের লাবণ্য কিছুমাত্র হ্রাস হইয়াছিল না। যেন স্মিত মুখে পরম

সুখে নিদ্রাভিভূতা হইলেন। তাঁহাকে মণিকর্ণিকার ঘাটে লইবার সময়ে দুই ধারে "দয়াময়ী মাই যাতী হ্যায়, দারিদ্রকা কা গতি হোগা" বলিয়া সহস্র সহস্র নরনারী রোদন করিতে করিতে শবানুগমন করিয়াছিল।

সম্পূর্ণ।